বহুরূপা

নুরুল মোমেন



নবযুগ প্রকাশনী
২১বি, নাসিরুদ্দীন রোড, কলিকাতা-১৭

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৬৫

প্রকাশক
এ. হক
২১ বি, নাসিরুদ্দীন রোড
কলিকাতা-১৭

মুদ্রাকর
শ্রীগণেশপ্রসাদ সরাফ্
মুদ্রক মণ্ডল লিমিটেড্
১৭৬, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

পরিবেশক
ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬, বাংলা বাজার, ঢাকা

দাম ২'৫০

যাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা নিয়ে আমার সর্বপ্রথম লেখা 'রূপান্তর' নাটিকা
আনন্দ বাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে
আমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা দিয়েছিল সেই মনীষী
কবি মোহিতলাল মজুমদারকে
আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের
অল্প আয়াস স্বরূপ এই
পুস্তকের আরম্ভেই
স্মরণ করলাম।

ভূমিকা

অনেকদিন আগেকার কথা। শ্রদ্ধেয় কবি মোহিতলাল মজুমদারের পরিচয়পত্র হাতে ঢাকা থেকে যুবক নুরুল মোমেন একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে ক'রে আমার কাছে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে স্বয়ং মোহিতলাল এসে পড়লেন। তার আগেই শ্রীমান মোমেন-এর নাটকটির সাহিত্য-রূপই শুধু আমাকে মুগ্ধ করে নি, লেখক স্বয়ং একটি ভুয়া টেলিফোনের সাহায্যে সমগ্র নাটকটি অভিনয় ক'রে শুনিয়ে নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার আশাও আমার মনে জাগিয়েছিলেন। মোহিতবাবু এলেন এবং যে-কোনও সাহিত্যিক বন্ধু আমাদের আসরে উপস্থিত হ'লেই অভিনয় ক'রে পড়বার হুকুম সোৎসাহে দিতে লাগলেন নাট্যকারকে। ফলে নাটকটি কলকাতার সাহিত্যিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল মনে আছে। লেখক সম্বন্ধে মোহিতলালের ও আমার উচ্চ ধারণা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, একথাও স্মরণ আছে। রচনাটি 'শনিবারের চিঠি'তে মুদ্রিত হওয়ার পর খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। নাটকটির বিশেষত্ব ছিল—সেটি এক অঙ্কে একক অভিনেতার উক্তিতে সম্পূর্ণ। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের "বিনি পয়সার ভোজে"র মত। তবে 'নেমেসিসে' হালকা হাসি নয়, গভীর সমস্যামূলক জীবনদর্শন ছিল।

আজ অনেক বছর পরে আমার সেই প্রিয় লেখকের একটি হালকা প্রবন্ধের (রম্যরচনা বলতে আমি রাজি নই, কারণ এতে গভীর চিন্তারও খোরাক আছে।) বইয়ের ছাপা কয়েকটি ফর্মা হাতে পড়াতে সেই পুরনো দিনের কথা আমার মনে পড়ল। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম ছাপা পাতাগুলো। না; সেদিন আমাদের ভুল হয় নি। শক্তিমান লেখক আমাদের আশা সার্থক করেছেন। তাঁর চিত্ত যেমন সজাগ, চোখ যেমন

প্রখর, লঘুভঙ্গিতে মনের গভীর ভাব ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতাও তেমনি অসাধারণ। ভাষা তীক্ষ্ণ। ষ্টীল বা অ্যাডিসন এ যুগে বাংলাদেশে জন্মালে এই রকমই লিখতেন। এমন একখানা বই সাধারণের দরবারে হাজির ক'রে দিতে শুধু আনন্দ নয়, গর্বও হচ্ছে। সমগ্র বইটা না পড়ুন, "আর একটি আপেলের কথা" বাংলাদেশে সন্তানভাগ্যে ভাগ্যবান সকল বাপ-মা যেন পড়েন। আমার একটা দুঃখ এই যে বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গেছে। তার পূর্বার্ধের বহু রূপই 'বহুরূপা'য় দেখতে পাচ্ছি। এর সঙ্গে পশ্চিমার্ধের রূপ যুক্ত হ'লে এত-ভঙ্গ-বঙ্গদেশের বহুরূপীত্ব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেত।

১০ই অক্টোবর, ১৯৫৮ **শ্রীসজনীকান্ত দাস**

সূচীপত্র

পরমসিদ্ধি

কথায় বলে স্বার্থসিদ্ধিই পরমসিদ্ধি। আমাদের দেশে সবাই কম-বেশী এ পরমসিদ্ধি এমন রপ্ত করেছেন যে, একে একটা দর্শনের পটভূমিতে ফেলে দেখার সময় এসেছে। স্বার্থসিদ্ধি করতে হলে জীবন সম্বন্ধে আপনার সঠিক চিন্তা দরকার। আপনার মনে করতে হবে পুরনো দিনের রেলের একটা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আপনি বসে আছেন। আপনারা বলবেন, 'এ নশ্বর জীবনে আমরা দু'দিনের মুসাফির' এ উচ্চ দর্শনের ইঙ্গিতই আমি করছি। অবশ্য এ উচ্চ দর্শন আমার জানা থাকলেও আমি নিজেদের এত বেশী জানি যে, তার ইঙ্গিত আমি করছিনে। আমার কথাটায় উচ্চ দর্শনের কিছু ইশারা থাকে তো তা' স্রেফ উর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করা। পুরনো দিনের রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে বসে আপনারা যদি উর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করতেন, তো কি দেখতেন? দেখতেন লেখা আছে: 'মালের উপর নজর রাখ। জুয়াচোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে।' সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চতুষ্পার্শ্বের লোকগুলোকে দেখলে মনে হতো, উহা বাইবেল বাণীর মতো সত্য।

ঐ নোটিশটা তুলে নেওয়ার একমাত্র কারণ হ'ল, আমি যা বুঝি, যে এমন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতেই শুধু নয়, সমাজের প্রতি স্তরে ঐ নোটিশ দেওয়ার দরকার হয়েছে; সুতরাং শুধু তৃতীয় শ্রেণীতে ওটা অবান্তর। এদেরই স্বজন যখন আমরা এবং যেন-তেন প্রকারেণ যখন স্বার্থসিদ্ধির পন্থা, তখন ইহা দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দরকার।

'নিজের চরকায় তেল দাও' কথাটা স্বার্থসিদ্ধির আদি ও প্রধান পন্থা রূপে যে যুগে ছিল, সেটা নিশ্চয়ই প্রাগৈতিহাসিক হবে। কারণ ইতিহাসের প্রথম থেকেই দেখি অন্যের চরকায় তেল দিয়ে লোক গুছাতে পেরেছে বেশী। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই পন্থা যদি এত প্রাচীনই হয়, তবে এটা একটা 'ইজমে'র পর্যায়ে উন্নীত হয়ে oilism-এ দানা বাঁধতে পারল না কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তি, পাত্র ও অবস্থাভেদে এত বিভিন্ন পদ্ধতিতে এর ব্যবহার চলেছে যে, ওরকম একটা দার্শনিক দানা বাঁধতে পারেনি;

সেইজন্য 'ইজম' না চলে 'থেরাপি' কথাটা চলেছে। 'থেরাপি' কথাটা সমষ্টির ভেতর ব্যক্তিগত দানকেও স্বীকার করছে।

এই পদ্ধতির সর্বপ্রধান বাধা হ'ল এই যে, এতে মাত্রা রাখা মুশকিল। খোশ ও আমুদে যারা, তারা যদি খোশামুদে হয়, তা' হলে তাদের মাত্রাজ্ঞান থাকে। কিন্তু যারা একে নিত্যচর্চায় পেশাদারী স্তরে তুলেছে, তাদের তাল-বেতাল জ্ঞান নেই। অনর্থ ঘটতে পারত অনেক; কিন্তু ভাগ্যক্রমে প্রভুরা নির্বিশেষে নিরেট হওয়ায় তা' ঘটাব আর সম্ভাবনা নেই। বরং প্রভুরা যে প্রশংসা পান, আকাশচুম্বী হলেও মনে করেন যে তা' তাঁদের প্রাপ্য। যা পান না, তুচ্ছ হলেও মনে করেন তাঁরা তা' থেকে বঞ্চিত হলেন। কোন কোন প্রভু এমেচার বিবেক দিয়ে প্রশংসাকে বিচার ক'রে সঠিক উপলব্ধির চেষ্টা করেন; কিন্তু ঐ চেষ্টাই মাত্র। দশ জনে মিলে তাঁকে ভগবানেব মতো ভূত ক'রে ছেড়ে দেয়। ধরুন, কোন প্রভু কোনখানে এক বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটা সুবিধের হ'ল না, তা' প্রভু নিজেই বুঝলেন। হঠাৎ প্রভুব দেখা ভক্তের সঙ্গে। ভক্ত বলল: "স্যার, আপনার বক্তৃতাটা মর্মস্পর্শী হয়েছিল।" প্রভুর মনে 'মর্মন্তুদ' কথাটা 'মর্মস্পর্শী'র পাশাপাশি কেন যেন এসে দাঁড়াল। ঈষৎ বিরক্ত হয়ে চুপ ক'রে রইলেন। দেখা হ'ল ঐ গোষ্ঠীর দ্বিতীয় ব্যক্তিব সঙ্গে। সে বলল: "স্যার, আপনি উকিল হলেন না কেন? যেমনি বলাব ভঙ্গী, তেমনি জোরাল যুক্তি।" প্রভুর বিবেক এবার কুপোকাত হ'য়ে গেল। পরে যখন দেখা হ'ল একজন স্পষ্ট বক্তার সঙ্গে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করাব সাহস পর্যন্ত পেলেন না যে, বক্তৃতাটা কেমন হয়েছে। সে চলে যাচ্ছে দেখে, মরিয়া হয়ে একটা ভাল মত তার কাছে ভিক্ষে ক'রে নেওয়ার জন্যেই যেন প্রশ্ন করলেন: "সবাই বলছে, আমার বক্তৃতাটা নাকি ভাল হয়েছিল?" স্পষ্ট বক্তা সংক্ষেপে বলল, "বলতেও পারে।" এই দিক্‌ভ্রষ্ট উত্তরটাকেই প্রভু প্রশংসার দক্ষিণা হিসেবে গ্রহণ ক'রে হয়তো খুশী হয়ে উঠলেন। এই যখন মানবাত্মার অবস্থা, তখন এই প্রথম পন্থাই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অদ্বিতীয়। মহাত্মা সক্রেটিস বেঁচে থাকলে এর চিবন্তন ফরমুলা এই বাণীতে দিতেন—ভক্ত জানে যে সে জানে, প্রভু জানেন না যে তিনি জানেন না; প্রভু বলেন যে তিনি জানেন, ভক্ত বলে না যে তিনি জানেন না।

প্রভুকে প্রয়োজন-গতিকে ভক্তের দ্বারস্থও হতে হয়। সে-স্থলে পরস্পর পিঠ চুলকানিই হ'ল স্বার্থসিদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। প্রভুর শ্যালকটি ম্যাট্রিক পাস,

কিন্তু দেড়শ' টাকা মাইনে তাঁর চাই। ডেপুটিকে ডেকে তিনি বললেন : "দেখত এর কোনরূপ একটা কেস তৈরি ক'রে দিতে পার কিনা ; দেড়শ' টাকা দিলে ওপর থেকে আবার ধরবে। তুমি কোনরূপ একটা উপায় ক'রে দাও ভাই।" বলেই পিঠ-পিঠ বললেন : "হ্যাঁ, তোমার প্রমোশনের জন্যে এবার আমি বেশ জোরালভাবেই লিখছি, হয়ে যাবে।" দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে—এই যখন শর্ত, তখন ডেপুটির মাথা খুলে যাওয়ার কথা। তিনি শ্যালককে ষাট টাকা বেতনের এক কেরানী ক'রে ওপর থেকে নিযুক্ত করিয়ে আনলেন। নিয়োগপত্রে প্রাথমিক দৃষ্টি দিয়েই প্রভু চটে উঠলেন, বললেন : "নেমকহারামি করলেন আপনি ? আমি আপনার প্রমোশনের বন্দোবস্ত করলাম, আর আপনি—" এই পর্যন্তই বলতে পারলেন মাত্র। কারণ, গভীর-ভাবে নিয়োগপত্রে মনোনিয়োগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন, ডেপুটি কী চিজ। নিয়োগপত্রে দেখা গেল বেতনের সঙ্গে উপরি ভাতার ব্যবস্থা আছে এবং উপরি ভাতা অফিস-কর্তা অর্থাৎ প্রভু স্বয়ং যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন তাই দেবেন। একটা ভাতার খসড়াও পেশ করা হয়েছে প্রভুর কাছে—অফিসিয়াল কেতায়। সাইকেল এলাউন্স পঁচিশ টাকা, বাড়ী ভাড়া পঁয়ত্রিশ ; আর যে কাজটি শ্যালকদেবের উক্ত কাজের সঙ্গে পূর্বে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, সেটাকে আবার উদ্‌বৃত্ত কাজ হিসেবে শ্যালকের ভাগে দেখিয়ে তার জন্যে উপরি ধরা হয়েছে ত্রিশ। 'জলবিন্দুর মধ্যে বিশ্বদর্শন' ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ডেপুটির কৃপায়।

ধোঁকার উপর স্বার্থসিদ্ধি হয় এবং নিতান্ত নিরীহভাবে সে ধোঁকা দেওয়া যেতে পারে। কথাটা যারা পরস্পর বিসংবাদী বলে মনে করছেন, তাঁরা জলিলের ব্যাপারটা জানেন না। সেবার জলিলের যে প্রভু এলেন, তাঁর নেক নজর থেকে জলিল পূর্ব হতেই ছিল বঞ্চিত। এসেই তিনি জলিলকে বদলি ক'রে দিলেন দিনাজপুরে। জলিল বদলির কথা শুনে প্রভুর কাছে গিয়ে বলল : "স্যার, আমাকে নাকি ফরিদপুর বদলি করেছেন ? আমি ফরিদপুরে যাব না ; চাকরি ছেড়ে দিতে হয় সে ভি আচ্ছা।" প্রভু শুনে বললেন : "সে কি ? তোমাকে তো দিয়েছি দিনাজপুর।" জলিল আহ্লাদিত হয়ে বলল : "দিনাজপুর ! তাই বলুন ! সে তো চমৎকার জায়গা। সব কি যে লাগিয়ে বেড়ায়।" পরের দিন জলিল দেখল, বদলি হয়েছে তার ফরিদপুরে,

বহু আকাঙ্ক্ষিত জায়গায়, শ্বশুরের দেশে। সংসারটাই যদি হয় ধোঁকার টাটি, তবে এরূপ ধোঁকা নিত্য জীবন-রসায়নে অপরিহার্য।

মেয়েদের নিমিত্ত ক'রে কার্যসিদ্ধির রীতি সব দেশেই আছে। নারীকে স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছিল শয়তানই নাকি প্রথম। কিন্তু পন্থাটা শয়তান একচেটিয়া রাখতে পারেনি। আমাদের দেশে এমন চাকুরে কমই আছেন, যিনি কাজের চাপে পড়ে কাজে ফাঁকি দিতে 'স্ত্রী ভয়ানক পীড়িত' বলে ছুটি নেননি। সত্যি কথা বলতে কি, স্ত্রীর অসুখের সংবাদবাহী টেলিগ্রামটি পড়ার সময় হৃদয়ের আনন্দ-স্পন্দন রুদ্ধ করা অনেক সময় মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফাঁকি দেওয়ার জন্যে মেয়েরা অন্যরূপেও কাজে আসেন। ধরুন, আপনি বহু ঘুরে একটি বাসা পেলেন; কর্তা উচ্চ একটা ভাড়া ঠিক ক'রে আপনার সঙ্গে রফা করলেন। পরে তিনি আরও বেশী ভাড়া পেয়ে অন্য একজনকে দিয়ে দিলেন সেটা। আপনি যখন গেলেন তাঁর কাছে, তখন তিনি মাথা চুলকিয়ে বললেন: "আর বলবেন না সাহেব, কি যে হয়েছে সব। আমার স্ত্রী এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর কাছে কবে নাকি কথা দিয়েছিলেন, তাই আর পারা গেল না। তাকেই দিতে হ'ল।" উভয় স্ত্রীই আপনার দুর্ভাগ্যের মতো নেপথ্যবাসিনী; সুতরাং এক্ষেত্রে জোরের সঙ্গে যা করতে পারেন তা' হ'ল নিশ্বাস-ত্যাগ।

'নিপাতনে সিদ্ধ'ই স্বার্থসিদ্ধির চরমসিদ্ধি। স্বার্থ নিপাতনে সিদ্ধ হয় তখন, যখন তার মধ্যে কার্যকারণ-পরম্পরা আপনারা দেখতে পান না। সে-সিদ্ধি ঘটে এমন অনৈসর্গিকভাবে যে, হোরেসিয়োর দর্শনশাস্ত্রেও তার বেড় পায় না। না পাওয়ারই কথা, কারণ, ব্যাপারটা হ'ল মর্ত্য থেকে স্বর্গের কলকাঠি ঘোরানো। ভেল্কি মনে করছেন? তা করুন; কিন্তু তার সঙ্গে এও ভেবে রাখুন যে, আমার হাবিব ভাই-ই তা' দেখিয়েছেন। বলি তবে: একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম, হাবিব ভাইয়ের বহু টাকা চুরি গেছে রাত্রে, কে বা কারা দোতলার গরাদ ভেঙে ঢুকে বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে চলে গেছে। গেলুম দৌড়ে। গিয়ে দেখি, লোকে জম-জমাট ক'রে রেখেছে জায়গাটা। হাবিব ভাই চুপ ও নির্বিকার; কি যেন চিন্তা করছেন। সবার মুখেই প্রশ্ন: "কত গেল?" তিনি তাদের কোন উত্তর না দিয়ে মাথাটা উর্ধ্ব-নীচ, কখনো পাশাপাশি নাড়ছেন; কিছুই

বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ হবুচন্দ্র রাজার মতো হিং টিং ছট না বলে ছন্দাক্রান্ত-ভাবেই বললেন: "পাঁচ হাজার তিন শ' তেরো।" অমনি শূন্য আকাশের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল কথাটা; অর্থাৎ সব সাফ ক'রে নিয়ে গেছে। লোকজন চলে গেছে। দেখি এক স্বর্গীয় রোশনাইয়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম, বুঝে বললেন: "চুরি গেছে মাত্র দু'হাজার তিন শ' পাঁচ।" আমি বললাম: "তবে যে বললেন পাঁচ হাজার তিন শ' তেরো?" উত্তরে বললেন: "কারণ আছে হে, চল উপরে দেখবে।" গেলাম উপরে। কারণ যা দেখালেন তা' দেখলাম এক সেট পদচিহ্নে আসা-যাওয়ার ছাপ—জানালা থেকে বাক্স এবং বাক্স থেকে জানালা অবধি। সকাল বেলা যাকে স্মরণ ক'রে দৌড়েছি তারই পদচিহ্ন। ছোটবেলার স্মৃতিশক্তি সুড়সুড়িয়ে উঠল। বললাম:

'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে পুলিস কি ধ্বজা ধ'রে করিবেন যাহা করণীয়।'

তিনি এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, পুলিস চোর ধরবে এ-যেন এক ঠাট্টার কথা। তার পর বললেন: "পদচিহ্ন মাত্র একজনের দেখছ তো?' 'এক' কথাটার উপর জোর দিলেন। উত্তরে বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন: "তাতে এই সুবিধে হয়েছে যে, আমি ব্যাপারটিকে higher level অর্থাৎ উচ্চতর স্তরে নিতে সক্ষম হয়েছি।" 'উচ্চতর স্তরে! তবে কি এস্-পি বা আই-জি'র হাতে?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি। তিনি বললেন: "না হে না, স্বয়ং খোদার হাতে। এখন বুঝতে পারছ না, কিন্তু দু'দিন পরে বুঝবে।" দু'দিন পরে বুঝলামও। শহরতলির লেভেল ক্রসিং-এর কাছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেল। রায়ট লাগে লাগে; এর মধ্যে জানা গেল যে, চুরির মাল ভাগে না মেলায় এই হত্যাকাণ্ড। দেখা হাবিব ভাইয়ের সঙ্গে। বললেন: "দেখলে তো? পাঁচ হাজার তিন শ' তেরো বলায় কি সুবিধে হয়েছে? একা এসেছিল কি না, সাক্ষী ছিল না, পাঁচ হাজার টাকা সে যে নেয়নি তা' প্রমাণ করতে পারেনি। দলের লোকের মনে এই বিশ্বাস যে, সে তিন হাজার টাকা গাপ মেরেছে। ফলে এই দশা। এ তোমার জেল-টেল-এর চাইতে ভাল হয়ে গেল; higher level-এর ব্যাপার কিনা।" বলে হোহো ক'রে মন খুলে হাসলেন।

তদবির যে লেভেলেই চলুক, মোটের উপর স্বার্থসিদ্ধি করতে হলে বুদ্ধিকে ক্ষুরধার ক'রে রাখতে হবে, যাতে কোন কিছুতেই না বাধা পায়। ধরুন,

যেমন আপনি কোন একটি পত্রিকায় লেখা দিতে গিয়েছেন। দেখা হ'ল সম্পাদকের সঙ্গে; চেহারা তাঁর যেমন অদ্ভুত, সম্পাদকীয়ও তেমনি উদ্ভট। আপনি বললেন: "আপনার সম্পাদকীয় পড়ে আপনার সম্বন্ধে যে আইডিয়া করেছিলাম, আজ আপনাকে দেখে তা' আমার সার্থক হ'ল।" দেখবেন, তিনি না-হক খুশী হয়ে উঠেছেন। এর পর দেখা হ'ল শিশুবিভাগের পরিচালকের সঙ্গে। তিনি এমনই পরিচালনা করেন যে, শিশু মনের উন্নতির কোন খোরাক থাকে না তাতে। তাঁকে দেখে আপনি বললেন: "সত্যি, আপনার বিভাগের লেখা পড়লে মনে হয় মনটা চির-শিশু রয়ে গেছে।" কথাটা সুখী করবে তাঁকে। এল মহিলা মহফিল। চেহারা দেখে বুঝলেন কেন যে ইনি সৌন্দর্য-চর্চার কথা ইংরেজী থেকে বাঙলা ক'রে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেন, এবং তা' পড়েই মনে হয়। তাঁকে বললেন: "আপনার সৌন্দর্য-চর্চার মধ্যে থাকে সত্যিকার দরদ।" দেখবেন তাঁর মুখ যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এমন সময় এলেন স্বয়ং কর্তা। বললেন: "কি ব্যাপার, প্রশংসার ছড়াছড়ি যে! তা' আমাকে আর কি বলবেন, আমার তো কোন গুণই নেই।" কথাটার সত্যতা আপনাকে ভড়কে দিলেও, আপনি হিম্মতের সঙ্গে বলবেন "না, তা' কেন? কবিই তো বলেছেন: Having nothing yet hath all" দেখবেন আপনার কথা তাঁকে অত্যন্ত খুশী করেছে। আপনার হবে জয়জয়কার।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি 'কোন একটি পত্রিকা'র কথা বলেছি; আমি যে পত্রিকায় এ লেখা দিচ্ছি সেটা অবশ্য নয়। কারণ এ পত্রিকার সবাই গুণী, বিদ্বান ও বুদ্ধিতে দীপ্ত—এই, এই মনে করছেন তো, আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এ সব বলছি? তা' নয়; বিশ্বাস না করুন তো এর অতীত সংখ্যাগুলো পড়ে দেখুন; না পান তো ভবিষ্যতের সংখ্যাগুলো রীতিমত পড়ে আমার কথাটা যাচাই করুন।

প্যাকেট দুই কেনা সিগ্রেটে আমার মাস যায়। সুতরাং এ বিষয়ে হয়তো এমন কারও লেখা উচিত ছিল যিনি এক সিগ্রেট থেকে অন্য সিগ্রেটে আগুন 'রীলে' ক'রে ম্যারাথন দৌড়োচ্ছেন কালের কক্ষপথে। চিরন্তন আগুন জ্বলে চলেছে সিগ্রেট হতে সিগ্রেটে এবং এ জ্বলুনি যে কি জ্বলুনি তা' তিনি বুঝতে পারছেন প্রত্যেক মাসে সিগ্রেটের বিল শোধ করার সময়ে। ফলে প্রত্যেক বছর ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারটায় সিগ্রেট খাওয়া ছেড়ে দেখার প্রতিজ্ঞা করছেন, এবং শেষ সিগ্রেট খাওয়ার পর্ব হিসেবে টিনকে টিন শেষ করছেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে। শেষ সিগ্রেটটি সুখটানে সুখটানে শেষ করছেন ঘড়ি ধরে, তার পর গালভরা ধোঁয়া বুকভরা নিশ্বাসের সঙ্গে ছেড়ে বলছেন : "ব্যাস খতম" ; নতুন বছরে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই বলছেন : "এতদিন এতঘণ্টা সিগ্রেট খাইনি জান ?" এবং কারও জানতে দেরি হচ্ছে না ; হঠাৎ একদিন একটিন সিগ্রেট বের ক'রে বলছেন : "আজ থেকে আবার আরম্ভ।"

কিন্তু এ রকম ধূমপায়ীরা নেশার বাইরে কিছু দেখতে পান না। অতএব আমাকেও লিখতে হচ্ছে। ধূমপানটা আমার কাছে একটা দার্শনিক ব্যাপার ; প্রত্যেক সিগ্রেট খাওয়ার পেছনে থাকে একটা উদ্দেশ্য।

নেশা হিসেবে খায় এ তো জানা কথা, কিন্তু পেশা হিসেবে খায় তা' জানেন ? ভবঘুরেদের মধ্যে যারা ব্ল্যাক-মার্কেটিং ক'রে রাতারাতি বড় লোক হয়েছে, অথচ বিড়ির টানটা এখনো সিগ্রেটের উপর ভাল রকম রপ্ত করতে পারেনি, তাদের ভেতর নেশার টানে নয়, নতুন বড় লোক হয়েছে সেটা জাহির করার জন্য। পেশা হিসেবে ভরা টিন সিগ্রেট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং ডানে বাঁয়ে তুলে ধরে বলছে, "নিন একটা।"

আমার সিগ্রেট খাওয়াটা নেশা বা পেশার অন্তর্গত নয়। প্রত্যেক সিগ্রেট খাওয়ার পেছনে থাকে একটা তত্ত্ব। গত মাসে দু'প্যাকেট খেয়েছি কিনে, না কিনে খেয়েছি সত্তরটা। সুতরাং খাওয়াটা দু'পর্যায়ে পড়ে— খেয়েছি ও খেতে হয়েছে।

খেতে হয়েছে কেন তাই বলছি। আগের মতো মানুষের মন নেই: কিংবা মন আছে তো সামর্থ্য নেই; কিংবা সামর্থ্য আছে তো সামগ্রী নেই। কাজেই কোথাও বেড়াতে গেলে আতিথ্যের খাতিরে চটপট দুটো পরাটা ভেজে ও মামলেট তৈরি ক'রে আমাদের সামনে দেবে এরকম ভদ্রতার আশা যদি করি, তবে বলতে হবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা এখনো আমরা ভুলতে পারিনি। গহনার মতো আতিথ্যের উপাদানেও হালকা প্যাটার্ন আধুনিক যুগের চাহিদা; গোস্ত-পরটার জড়োয়াত্ব থেকে আতিথ্যকে রক্ষা করেছে হালকা প্যাটার্নের চা-বিস্কিট। মানসিক কিংবা আর্থিক অবস্থা ভেদে আপ্যায়ন আরও সূক্ষ্মতর রূপ নেয়: কেউ দেন চকোলেট, কেউ সিগ্রেট। সূক্ষ্মতম হ'ল তাঁদেরই আপ্যায়ন যাঁরা দেন রূপোর ডিবেয় মৃগনাভি-গন্ধী এলাচদানা। এর প্রত্যেকটাই যখন উপাদান হিসেবে অতিথি-সৎকারের পূর্ণ দাবি রাখে, তখন তার কোনটাকে বাদ দিলে ভদ্রতার অঙ্গহানি হয়। সুতরাং সিগ্রেট খাওয়াটাই ভদ্রতার পক্ষে যখন চরম খাওয়া হয়ে দাঁড়ায়, তখন আর না খেয়ে পারিনে। বেশীর ভাগই সিগ্রেট আমার খেতে হয়েছে এমনি অবস্থায়।

এ ছাড়া অন্য কারণে আমার সিগ্রেট খেতে হয়েছে। আমার জীবনে আমি একবার অন্ততঃ সিগ্রেট খেয়েছিলাম এই দেখানোর জন্যে যে আমার গুরুজনে ভক্তি আছে। আপনারা যাঁরা এ কথাকে পরস্পর বিসংবাদী বলে মনে করছেন তাঁদের ঘটনাটা বলতে হয়: আমার এক দূর সম্পর্কের মামা এলেন বাড়ীতে। বাল্যকাল থেকে স্পষ্টভাবে কথা বলার অনুমতিই শুধু নয়, ট্রেণিংও পেয়েছিলাম। সুতরাং পুরনো-পন্থী মামা নিতান্ত বেয়াদব বলে আমায় ধরে নিয়েছিলেন। মা একদিন বললেন: "কিরে, ভাইজানের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিস নাকি? তোর সম্বন্ধে ভাল ধারণা নেই তাঁর। একটু ভদ্র ব্যবহার করিস তার সঙ্গে।" মা'র কথা অনুসারে চেষ্টা করলামও; কিন্তু তাঁর মাপকাঠিতে বেড় পাওয়া আমার সাধ্যে কুলাল না। হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এল। যেমনি আসা অমনি কাজে লাগানো। মা খুশীতে বাগবাগ। একদিন হেসে বললেন: "তোর সম্বন্ধে ভাইজানের মত একেবারে পালটে গেছে দেখছি। কি কাণ্ড করেছিলি বল তো?" মা'র কাছে যে কথা বলতে পারিনি আজ আপনাদের সে কথা বলছি। মামার পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি একটা সিগ্রেট ধরিয়েছিলাম, যাতে তিনি এসে দেখতে

পান আমি সিগ্রেট খাচ্ছি। তিনি ঠিকই ঢুকলেন এসে, আমি তড়বড় ক'রে সিগ্রেটটা ফেলে দিলাম। তিনি সদ্য আগুন-জ্বালা সিগ্রেটটা পতিত অবস্থায় দেখে তাড়াতাড়ি সরে গেলেন ; কিন্তু খুব খুশী হয়ে গেলেন।

গুরুজনেরা ছেলেদের সিগ্রেট না-খাওয়ার চাইতে খেতে খেতে তাঁদের দেখে ফেলে দেবে, তাই পছন্দ করেন বেশী।

আমাদের মুরুব্বী আছেন দু'শ্রেণীর। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করি যাঁদের তাঁরা হলেন প্রথম শ্রেণীর ; অন্যেরা হলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর পায়ে হাত দেওয়াতেই তাঁদের মুরুব্বিত্ব স্বীকৃত হয় ; তাঁরা খুশী হয়ে ওঠেন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীকে কী ক'রে বুঝাই যে তাঁরাও মুরুব্বী? তাঁদের বুঝানোর একমাত্র উপায় তাঁদের দেখে আত্মীয়তার দূরত্ব হিসেবে, অর্ধদগ্ধ অবস্থায় সিগ্রেট ফেলে দেওয়া কিংবা ব্যর্থভাবে হাতের নিচে লুকোবার চেষ্টা করা। এরূপ করার মধ্যে তাঁরা পাবেন গুরুজন মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি।

আপনারা যাঁরা উন্নতি করেছেন এবং উন্নতি করা সত্ত্বেও পূর্বের মতো অমায়িক ব্যবহার চরিত্রে রাখতে পেরেছেন, তাঁরা দেখবেন যে, তাঁদেরও বহুক্ষেত্রে অহঙ্কারী বলে ধরা হচ্ছে। কারণ কি জানেন? কারণ আপনার উন্নতি হলে আপনার সম্বন্ধে পূর্ব-পরিবেশের সকলের ধারণা অযথাই যাবে পালটে। আপনার যে ব্যবহার গা-ঘেঁষা বলে মনে হতো, তখন তা' তাদের কাছে লাগবে পিঠ-চাপড়ানো গোছের। আপনার স্বভাবকে কুনো বলে যাঁরা ধরতেন, তাঁরা তখন সেটাকে মনোবৃত্তির উচ্চস্তরের কিছু ধরে বলবেন exclusive.

এসব ক্ষেত্রে আপনার মন চাইবে জানতে যে, বন্ধুটি কতদূরে সরে গেছেন। সিগ্রেট কেসটা খুলে তাঁর সামনে ধরুন ও লক্ষ্য করুন তাঁর নেওয়ার ভাবটা ; তার ভেতর ঠিক পাবেন দূরত্বের পরিমাপটা। বন্ধু যদি নিঃসঙ্কোচে নেন, তবে বুঝবেন তিনি ঠিকই আছেন ; তখন আপনি আগের মতোই অন্তরঙ্গভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারেন : "তোমার সেজ ছেলেটা কত বড় হ'ল?" সস্তা সিগ্রেট যদি আপনার কেসে থাকে, তা'হলে দেখবেন আপনার বন্ধুটি ওটা দেখামাত্রই অনেকটা কাছে এসে গেলেন যেন! পুরনো বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার মতো আর কিছু নেই। জীবনে উন্নতির শেষে যাঁরা আসেন তাঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ; মনের আদান-প্রদান তাঁদের সঙ্গে

হয় খুচরো : না থাকে সে সমাজে নেওয়ার তাগিদ, না থাকে দেওয়ার উচ্ছলতা, সুতরাং বন্ধুত্ব জম-জমাট হয় না।

আমি সামাজিক কোন্ স্তরে উঠেছি, তা' বুঝতে পারি এই সিগ্রেটের মাধ্যমে। ধরুন, কোন মিস্টার 'ক'য়ের কথা ; তিনি বেশ নামকরা লোক। প্রথমে যখন তাঁর সেখানে যেতাম, তখন অন্য লোকের সঙ্গে যেমন কথা বলেন তেমনি দুটো-একটা কথা বলে বিদায় দিতেন। পরে এক সময় এল যে, তিনি আমাকে সিগ্রেট 'অফার' করতে লাগলেন। বুঝলাম অবস্থার ক্রমোন্নতি হচ্ছে ; তার পর যে দিন হঠাৎ দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলেন, সেদিন নির্ঘাত বুঝলাম যে, আমি আর সে পুরনো আমি নই। আত্মদর্শনের এরকম সুবিধে হারানোর ভয়েই আমি সিগ্রেট খাওয়াটা ছাড়ি নে।

মনে দুরুদুরু ভাব শুধু যে ছোট বড়র সামনে অনুভব করেন তা' নয়, বড়ও ছোটর সামনে করেন। মন্ত্রী করেন যখন বেকায়দায় প'ড়ে তাঁকে সাংবাদিক কনফারেন্স করতে হয়, মাস্টার করেন যখন ঠিক মতো তৈরি না হয়ে ক্লাস নেন, দারোগা করেন কনেষ্টবলের সামনে, একত্র ঘুষ খেয়ে ; এমন কি তৃতীয়পক্ষের জাঁদরেল স্ত্রীও করেন স্বামীর প্যাণ্ট ইস্তিরি করতে সেটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে। কখনো যদি এরকম অনুভব করেন কারো সঙ্গে দেখা করতে, তখনই এক প্যাকেট বেশ দামী সিগ্রেট পকেটে ফেলে সোজাসুজি চলে যান। দিব্যি বসে পার উপর পা দিয়ে 'সেটি' থাবলে ঠেস দিয়ে বসতে পারেন তো ভালই, একটি সিগ্রেট বের ক'রে মুখে গুঁজে টিনটা হাত বাড়িয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষিতের সামনে ধরে বলুন, "Have one please" ; দেখবেন আবহাওয়াটা যেন ম্যাজিকে আপনার মনের মতো হয়ে গেছে।

বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়ার যে কথা আছে, সেটা যে সিগ্রেটের ধোঁয়া তা' মাত্র সেদিন আমি এক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটো সিগ্রেট খেয়ে বুঝতে পেরেছি। পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। হঠাৎ একজনার একটা উত্তর পড়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। পড়লাম বহুবার, কিন্তু অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না। বড় অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। অন্ধকারে ভূতের অস্তিত্বের মতো মানে মনে করতেই একটা মানে যেন আশেপাশে ঘুরে ফিরছে মনে হ'ল ; কিন্তু হঠাৎ দেখতে না পেয়ে মনটা ছমছম করতে লাগল। একটা সিগ্রেট জ্বাললাম। ধীরে ধীরে টানতে কঠিন প্রচেষ্টায় অনুভূতি-সাপেক্ষ একটা মানে উদ্ধার করলাম। একটু অমনোযোগে কর্পূরের মতো সেটা উবে না যায়, সে

জন্যে উদ্ধার-কৃত মানেটাকে হ্রস্ব-নোটে আবদ্ধ ক'রে, চটপট প্রশ্নপত্র খুললাম। খুলে পড়ে আবার বিহ্বল হলাম, কারণ কোন্ প্রশ্নের চাহিদা মেটানোর প্রচেষ্টা যে সেটায় চলছে তা' বুঝতে পারলাম না। Zig-saw puzzle মিলানোর মতো প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম, মিলল না। আর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বিছানার উপর চিৎপাত হয়ে বেশ টানলাম। বুদ্ধি একেবারে সাফ হয়ে গেল, বুঝলাম ফক্কড়ের পাল্লায় পড়েছি, মন যে ধীরে ধীরে স্থিরতা লাভ করতে পারল, তা' বুঝলাম যখন দেখলাম যে, তাকে শূন্য দিতে পেরেছি।

সিগ্রেট খাওয়াটা নিষিদ্ধ থাকায় বাল্যকালেও খেয়েছি। আফতাব ছিল আমাদের গুরু। সে সিগ্রেট খাওয়ার মধ্যে দেখত বড় দর্শন বাল্যকাল থেকেই। একবার আমাদের স্কুলের পণ্ডিত আফতাবকে পান-গ্রস্ত অবস্থায় হঠাৎ পাকড়াও করেন। "সিগ্রেট খাস কেন?" বলে চোখ পাকিয়ে তার দিকে চাইতেই সে অম্লান বদনে বলল: "জানেন না স্যার?

"তাম্রকূটং মহাদ্রব্যং
সেবনে য মহৎ ফলং
অশ্বমেধ সমং যজ্ঞং
টানে টানে ভবিষ্যতি—"

বলেই ব্যাখ্যা করল: "একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি তামাকটা খেতে পারেন স্যার, তবে তা' হবে অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো! কারণ প্রত্যেক টানে আপনি এগিয়ে যাবেন বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে—" পণ্ডিতমশাই কান মলে দিয়ে বললেন: "তোর মৃত্যুর দিকে—।" আফতাব দমলো না, বলল: "আপনার বেতন বৃদ্ধির দিকেও স্যার।"—বলেই এক দৌড়।

যেদিন তাড়াতাড়ি ক'রে কোনখানে যাওয়ার কথা, সেদিন বাস ষ্ট্যাণ্ডে গিয়েই একটা সিগ্রেট ধরাই নিশ্চিন্ত মনে। নির্ঘাত জানি সাত তাড়াতাড়ি যখন, তখন বাস দেরিতে আসবে নিশ্চয়ই। পথ চলার জন্যে ব্যগ্র মনকে প্রবোধ দিই, গন্তব্য পথে না চললেও ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি।

কথাগুলো ধোঁয়াটে হওয়ার আগেই শেষ করছি, কিন্তু শেষ করার আগে যিনি এটা পড়ার অবকাশ পাবেন না তাঁর উদ্দেশে বলি: "আপনি জানেন না আপনি কি হারাচ্ছেন।"

লেখার খেলা

আমি কথা দিয়েছিলাম ঈদ-সংখ্যায় একটা লেখা দেব। অন্য কোন ফরমাশ নয়। আমার যথা ইচ্ছা তথা একটা কিছু লিখে দেব।

যা-ইচ্ছে তাইও লেখা যায়, এবং সেটা হ'ল লেখার খেলা। মানে, যে কোন জিনিস, নগণ্যই হোক না কেন, তাকে রসাল ক'রে লেখা যেতে পারে। রস সৃষ্টি দেখুন কত সহজে হতে পারে। একটি খুব ছোট মেয়ে, তার মাকে জিজ্ঞাসা করছে: "মা, তোমার কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল?" মা হেসে বললেন: "কেন? তোমার বাবার সঙ্গে।" মেয়েটি উত্তর দিল: "ও, তা'হলে আপনা-আপনির মধ্যে বিয়ে হয়েছে।" দেখুন, হাজারো মজার কথা নানাভাবে কোন শিশুকে দিয়ে বলালেও এর মতো অল্পে রস সৃষ্টি করতে পারত না।

ঈদের দিন ধরুন আজ। আপনি বেরিয়েছেন। কত রকমের লোকেব সঙ্গে দেখা হ'ল। যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, তবে দেখবেন অনেককে নিয়েই একটা রসাক্রান্ত কিছু লিখতে পারবেন। কিছু নমুনা দিচ্ছি, যা ঘটে নি, কিন্তু ঘটতে পারত। চরিত্র ও ঘটনাগুলি সত্য হতে পারত। তবে আরম্ভ করি:

আমরা বন্ধুর ওখানে গেছি এবাব ঈদের দেখা করতে। দেখি রোস্ট করেছে কবুতরের। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "কিহে, কবুতরের রোস্ট করেছ যে!" সে বলল: "আরে, বাঙলা বানান ভুলের ভয়ে এই ব্যাপার ঘটেছে।" আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "মানে?" সে বলল: "আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু রোস্ট করার জন্য দুটি দোপায়া দিতে চেয়েছিলেন। কিছু ঢেঙা মুরগী দেখেছিলাম তার ওখানে। কবুতরও ছিল। ঈদের দু'দিন আগে মুরগী চেয়ে চিঠি লিখতে বসেছি, অমনি সন্দেহ হ'ল গ-এ হ্রস্ব ই, না গ-এ দীর্ঘ ঈ—মুরগীতে কোন্‌টা দিতে হবে। একবার ই-কার দিই, একবার ঈ-কার। শেষ পর্যন্ত সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলে অন্য একটা লিখে একেবারে কবুতর চেয়ে বসলাম। যাক বাঁচা গেল।" আমি বললাম: "মুরগীতে দুটোই হয়।" তার পর তার কি আফসোস।



ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম এক আত্মীয়ের বাড়ী। দেখি দু'জন প্রাচীন ভদ্দরলোকে এই ঈদের দিনেও ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। আত্মীয়টির ছেলে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে। প্রথম ভদ্দর লোকটি বললেন : "আপনি একটি জুয়াচোর, এমনি ক'রে আমার নামে সব কিছু বললেন।" অন্য ভদ্রলোকটি বললেন : "আপনি ছোটলোক, তাই এমনি বলতে পারলেন।" যা হোক, আমাকে দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁরা চুপ ক'রে চলে গেলেন। আমার বন্ধুটি আমাকে বসতে বলে নাস্তা আনতে ভিতরে গেলেন। আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম : "এই দুটি ভদ্রলোক যে এসেছিলেন, এঁদের পরিচয় জান?" ছেলেটি বলল : "ওঁরা নিজে যা পরিচয় দিলেন তাই জানি মাত্র।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম : "সেটা কি?" সে বলল : "কেন, একজন জুয়াচোর আর একজন ছোটলোক। তাই তো একজন আর একজনকে বললেন।" আমি হেসে উঠলাম। বাচ্চাদের সামনে আমাদের যে অনেক সময় চেপে যেতে হয় তা' আমরা ভুলে যাই।

ঝগড়া বেধেছিল যেভাবে তা' বন্ধুটি বললেন। দু'জনই সৈয়দ বংশের। সৈয়দ বংশের মানে তাঁদের নামের সঙ্গে প্রথমে সৈয়দ যুক্ত করেন, তার পর দূরবর্তী এক সৈয়দকে পূর্বপুরুষ ধরে বংশ স্থির ক'রে নেন। নামের সঙ্গে ছিল প্রথমে শেখ; লিখতেন ছোট ক'রে S দিয়ে। শেষে ঐ S কে সৈয়দ বলে চালান। বন্ধুই গোল পাকান। চট ক'রে বললেন : "আপনারা যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেখানে সৈয়দ বসিরুল্লাই তো আদি সৈয়দ। তার বংশধর তো আপনারা। বলা বাহুল্য, সৈয়দ বসিরুল্লার কথা বন্ধুর মনগড়া। দু'জনেই শুধু বলেন নি যে তাঁরা তাঁর বংশধর। একজন বলেছিলেন যে, বসিরুল্লা হতে তিনি ছ'পুরুষ নিচে; অন্য বলেছিলেন ন'পুরুষ, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনিই খানদানী বেশী—যেহেতু সৈয়দ বসিরুল্লা হতে তিনি ন'পুরুষ নিচে। বন্ধুটি এবার বললেন : "দেখুন, এ তো হতে পারে না, আপনারা দু'জনই এক বয়সী, একজন ছ'পুরুষ নিচে আর একজন ন'পুরুষ—তা' কি ক'রে হয়। আপনাদের একজন যে সৈয়দ বসিরুল্লার বংশধর তা' দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তবে অন্যের সম্বন্ধে নিশ্চয় হওয়া যায় না। এখন আপনারা ফয়সালা করুন, কে আপনাদের মধ্যে তাঁর বংশধর।" তাই নিয়ে এই ঝগড়া। যাক খানিকটা অনাবিল হাসলাম। হেসে উঠে পড়লাম।

এবার গেলাম এক সাহিত্যিক বন্ধুর ওখানে। গিয়ে দেখি আড্ডা বেশ

জমেছে। নতুন একটি ছেলেকে নিয়ে বেশ কিছুটা মাতামাতি দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম : "কি ব্যাপার ?" সকলে বললে "অপূর্ব কতগুলি ছড়া লিখেছে।" আমাকে দেখতে দিল। আমি পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম "এর প্রত্যেকটি ছড়া তুমি লিখেছ ?" সে বলল : "হ্যাঁ।" আমি বললাম : "ওবেদুল্লাহ, তোমাকে দেখে ভারী খুশী হলাম।" সকলে বলল : "ওর নাম তো আবদুল হান্নান।" আমি বললাম : "ছড়াগুলি ওবেদুল্লার।" তার পর ছেলেটি বের হয়ে চলে গেল। আমরা সুযোগ পেলেই অন্যের যা কিছু হোক অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করি।

ঈদের দিন আমার আর্টিস্ট বন্ধু জয়নাল আবেদীনের ওখানে যেতে ভয় করে। কারণ, বহু গুণগ্রাহী লোক সেখানে যায়, এবং তাঁদের প্রত্যেকেই যেন মনে হয় আর্ট সম্বন্ধে কথা বলছে তাক লাগানোর জন্যে। তবুও ভয়ে ভয়ে গেলাম। যা ভেবেছি তাই ঘটে গেল। একজন এলেন। বন্ধু সেমাই এনে দিলেন তার সম্মুখে। তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, একটা ছবির দিকে। কোনদিকে খেয়াল নেই। জয়নাল আবেদীন দেখে বললেন : "কি দেখছেন ?" তিনি বললেন : "অপূর্ব ! গতির কি লীলা-চাঞ্চল্য বদ্ধ হয়ে আছে ছবিটায় ! জীবন যেন ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তুলির টানগুলিতে।" বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করলেন : "এত ভালই কি লেগেছে ?" তিনি বললেন : "হ্যাঁ।" বন্ধুবর হেসে বললেন : "বহুত শুকরিয়া। কিন্তু আমি অন্য ছবি আঁকতে রঙের তুলি মুছেছিলাম মাত্র ওতে।" আমরা হেসে উঠলাম। কিন্তু ক্রিটিক বন্ধুটি নিরস্ত হলেন না। তেমনিভাবেই বললেন : "কিন্তু মোছার ভঙ্গীটাই দেখুন, একটা সর্পিল সূক্ষ্মতায় ক্ষীণায়মান হয়ে অপূর্ব একটা ছন্দ প্রকাশ করছে টানগুলো।" আর না, মনে করলাম এবার উঠি।

রাস্তায় এক কাণ্ড ঘটে গেল। আবদুস সাত্তারের সঙ্গে দেখা। পরিচয়ের প্রথমাবস্থায় তাঁকে মধ্যে মধ্যে ভুল ক'রে অন্যলোক মনে করতাম ; তা' তাঁর মনে খুব লেগেছিল। তাই তাঁকে ভাল ক'রে চিনে রেখেছিলাম। হ্যাঁ, আবদুস সাত্তার তিনি, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কোলাকুলি করলাম গাড়ী থেকে নেমে। তার পর বেশ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম : "আপনি কি বাড়ী পেয়েছেন ?" তিনি বললেন ; "আমার নাম আবদুস সাত্তার।" আমি বললাম : "আহ্, সে তো খুব জানি।" তিনি উত্তর দিলেন : "বা-রে, সেদিন আমার ওখানে না দাওয়াত খেয়ে এলেন ?" বুঝলাম নতুনভাবে

ভুল করেছি, নাম মনে রেখেছি ঠিক, কিন্তু বাড়ী যে পেয়েছেন তা' মনে রাখতে পারিনি। বুঝলাম হয়েছে। এখন বাড়ী ফেরা দরকার।

বাড়ীতে এসে শুনি, সর্বনাশ, সেমাই ফুরিয়ে গেছে, বহু মেহমান এসেছিল। সেমাইয়ের পরিবর্তে যা-কিছু একটা দিয়ে মিষ্টি মুখ করাতে গেলে অনেক খরচ, সুতরাং আবার বেরিয়ে পড়লাম। আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন : "বেরুচ্ছো যে, দুপুরে একটু ঘুমানো অভ্যেস, ঘুমুবে না?" আমি বললাম : "মৌলভী সাহেব নামাজের আগে যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন বেশ ঘুমিয়ে নিয়েছি।" বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু ভয় হ'ল যাঁদের সঙ্গে দেখা হবে,তাদেরকে যদি এমনিভাবে কলমের খোঁচা দিতে থাকি তো ঈদের দিনে ঠিক হবে না। তাই লেখাটি পত্রিকাতে পৌঁছে দিলাম সকলের আগে।

আর একটি আপেলের কথা

আপেল থেকে সর্বপ্রথম যে সত্য উপলব্ধি হয় সেটা ইডেনের বাগানে, আদম ও ইভ করেন। খোদার হুকুমের সর্বপ্রথম অবমাননার সূচক হ'ল সেই আপেল, যাতে ক'রে মানব-গোষ্ঠীর উপর এল খোদার বিধান—পৃথিবীর জীবন। দৈনন্দিন জীবন-যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যাপন নির্দিষ্ট হ'ল তাদের জন্যে।

দ্বিতীয় আপেল থেকে যে পরম সত্য উপলব্ধি হ'ল সেটা হ'ল ইংলণ্ডে, করলেন নিউটন। গাছের থেকে আপেল পড়ল তাঁর সামনে; পেলেন তিনি মাধ্যাকর্ষণের সন্ধান, প্রথম আপেলে মানুষকে যে জীবন-যুদ্ধের সম্মুখীন ক'রে দিয়েছিল, দ্বিতীয় আপেলের সত্যানুভূতি তাকে জয় করার দিল সন্ধান।

তৃতীয় আপেল পড়ল ঢাকারই একটা সম্ভ্রান্ত পাড়ায়—গাছ থেকে নয়, তাক থেকে; পড়ল একটা দু'বছরেরও কম শিশুর মাথার উপর। কিন্তু মুহূর্তে যা ঘটল তাতে Child is the father of man মনে ক'রে, এই শিশু কি রকম বাবাজীতে পরিণত হবেন এই জিজ্ঞাসা সত্যের আকারে এসে দাঁড়ান, এবং যার সামনে এসে দাঁড়ান সে বেচারা আমি।

মাত্র হাত দেড়েক উপর থেকে পড়েছিল আপেলটা, যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হতে চলেছিল অর্থাৎ ভারী মজার ব্যাপার মনে ক'রে শিশুটি মুক্তোর মতো দাঁতগুলো বের ক'রে হাসতে গিয়েছিল এবং হেসেছিলও খানিকটা; এর মধ্যে ছেলেটির নানী চিলের মতো ছোঁ দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে ডুকরে বললেন: "ওরে আমার নানুরে, মাথাটা তোর যে একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে রে।" সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিও হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। তার পর যেখানে আপেল পড়েছিল, পানি দিয়ে রগড়িয়ে দেওয়া হ'ল সেখানে যেন একটা ক্রিকেট বল এসে লেগেছে; আর্ণিকা এক ডোজ খাইয়ে দেওয়া হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। কসরতে ক্লান্ত নানী ছেলেটিকে ছোকরার কোলে তুলে দিয়ে প্রথম অবসরে যতক্ষণ একটু হাঁপিয়ে নিচ্ছিলেন, ততক্ষণে ক্রন্দনরত ছেলেটি হেঁচকি ফোঁপানির স্তর পার হয়ে ছোকরার কাঁধে মাথা নেতিয়ে দিয়ে হাত দেখিয়ে দেখিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করছিল। গুমোট একটা ভাব বাড়িটার মধ্যে। মা সেলাই করছিল, এই দৌড় ধাপের ছোঁয়ায়

সেও হাঁপাচ্ছিল। আমার মনে অনেক কথা বলার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছিল, কিন্তু উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি শীগগির হবে মনে হচ্ছিল না; তবে ছেলেটি যখন হাত দেখিয়ে দেখিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করছিল, তখন মৌকা যে বড় দূরে আছে, তাও মনে হচ্ছিল না। কারণ, জানতাম ছেলের পরিক্রমা কোন খাওয়ার জিনিসের উদ্দেশ্যে; কথা ফোটে নাই ভাল ক'রে, দেখিয়ে 'ওই' বলার অপেক্ষা। বুকের উপর থেকে একখানা ভারী পাথর যেন নেমে গেল যখন অন্য কামরা থেকে "উঃ ওইঃ উঃ উঃ ওইঃ" শুনলাম। একটু পরেই শ্রীমান হাতে একটি কলা নিয়ে হাঁটি-পা'র ছন্দে নানীর কাছে দৌড়ে এল। নানী কলাটি হাত নিয়ে ছেলার আগে, আর একটুখানি রসিয়ে পেয়ার জানানোর জন্যে, ছেলেমানুষের ঢঙে বললেন: "ওলে আমাল মানিক, মাতাতা ভেঙ্গে গ্যাতেলে"—ছেলেমানুষের মতো এই কথায় তখনই হাসতাম যদি না জানতাম যে, শতকরা আশি ভাগই মা-বাবা বা নানী-দাদী এটা মাঝে মাঝে খুব এস্তেমাল করেন। এর উপর আমার আরও আশ্চর্য লাগে যখন দেখি যে-ছেলের কথাই ফুটে নাই তার সঙ্গেও এমনি কথা বলেন; অথচ তার সঙ্গে অমনি করে কথা বলাও যা, ইংরেজীতে দর্শন আলোচনাও তাই—প্রতিক্রিয়া তার কাছে দুটোর একই রকম হওয়ার কথা।

যাক, আবহাওয়াটা হঠাৎ এত অনুকূল হয়ে পড়ল আমার মনে যা ছিল তা' বলার, যে, মন্তব্যের পুরো ডোজটাই দিয়ে ফেললাম: "আপনি তো ওর মাথাটি খাচ্ছেন।" এবং তাঁর সঙ্গে আমার ঠাট্টার সম্পর্ক থাকাতে কথাটাকে একটু হাসির জারক দিয়ে পরিবেশন করায় অম্ল হলেও, তাঁর মেজাজের তার বিগড়ে দিল না। তিনি হাসি-বিরক্তির একটা দু'ধারি কুঞ্চন মুখে এনে বললেন: "কি রকম?" আমি বললাম: "অতিরিক্ত আদর দিয়ে।" তিনি বললেন: "এমনিভাবে মারা গেলেই বোধ হয় তুমি খুশী হতে?" আমি বললাম: "আমার খুশিমতো ছেলেপিলেরা মারা গেলে, অতি অল্প ছেলেই মারা যেত; তা'ছাড়া শিশু-মৃত্যুর কারণ আমাদের দেশে আল্লার মর্জিতে এত বেশী আছে যে, আপেল পড়ে মারা যাওয়ার আর দরকার হয় না।" তাঁর মেজাজ চড়ে যাচ্ছিল; বললেন: "তুমি একেবারে ইংরেজের ভক্ত হয়ে গেছ; কোন ছেলে আছাড় খেলে তুমি ধরার পক্ষপাতী নও, কারণ ইংরেজ মায়েরা তা' করে না। ওরা ছেলেপিলেদের না ভালবাসে, না স্নেহ-যত্ন করে। ও-জাতই এ রকম—"বলতে বলতে আমার দিকে চেয়ে থেমে গেলেন। আমি বললাম:

"আপনি পড়াশুনা যথেষ্ট করেছেন, ইংরেজকে গাল দিতে চান তো কারণ খুঁজে বের করতে অভাব হবে না, কিন্তু দয়া ক'রে এমন কথা বলবেন না যে, তারা ছেলেপিলেদের আদর-যত্ন করে না।" বলে, বলে চললাম :

আমরা বলি, শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ; কবি তা' বলে কবিতা লেখেন, রাজনৈতিক ও বিদ্যাবিদ্ স্কুলে পুরস্কার বিতরণের সময় তা' বলেন। বাস্ ওই পর্যন্ত। আমরা কখনো সে কথা মনে ক'রে কোন কাজ করি না। বিলেতে শিশুকে শুধু মা-বাবার সন্তান হিসেবেই ধরা হয় না, তাকে ধরা হয় ভবিষ্যতের নাগরিক হিসাবেও। ধরুন, যদি কোন পিতা-মাতা, তা' তাঁরা যত বড়ই হউন, শিশুকে ঠিকমতো প্রতিপালন করতে না পারেন কিংবা অত্যাচার করেন, তবে গভর্নমেণ্ট সে শিশুকে তাঁদের কাছ থেকে নিয়ে ভাল কোন পরিবারে দত্তক হিসেবে, কিংবা প্রতিপালনের জন্যে দিতে পারে; এবং এ-রকম দেওয়া হচ্ছে Juvenile কোর্টের সাহায্যে। কোন মা বাবা প্রয়োজন-অতিরিক্ত শাসন করলে তাঁদের আদালতে জবাবদিহি করতে হয় এবং শাস্তিও কখনো কখনো পেতে হয়। শিশুকে তারা অনুসরণ করে জন্মের আগে থেকে এবং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটি নাগরিকজ্ঞানের পটভূমিতে তাকে মানুষ করে। ছেলেকে নষ্ট করতে চাই না এ-কথা যখন বলে, তখন নিজের অসুবিধা হবে তা' মনে ক'রে বলে না। এই মনে ক'রে বলে যে, সে অন্যেরও অসুবিধা ঘটাবে। নইলে ভালবাসা দয়া-মায়ায় তারা কারও পেছনে নয়। একটি মেয়ের জন্মের পূর্ব থেকে প্রথম ছয় মাসের কাহিনী শুনলে বুঝবেন।

ইংরেজ মেয়েদের মন সাধারণত ঘরমুখী। বিয়ে হবে, দু'একটি ছেলে-পিলে হবে, সুখে সংসার করবে—এই হ'ল ইংরেজ মেয়েদের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। আমি যে ইংরেজ পরিবারে ছিলাম, তাঁরা ছিলেন স্বামী-স্ত্রী, দু'জনের বয়সই ত্রিশের নিচে। মহিলাটি ছিলেন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, স্বামী ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি'র ছাত্র এবং একটা বড় ফার্মের কেমিষ্ট। তাঁদের ওখানে আমার যাওয়ার এক বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়। প্রথম দু'চার দিনের মধ্যেই জানলাম তাঁদের ছেলেপিলের জন্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে; এবং ছেলেপিলে হলে আর বেরুতে পারবেন না বলে খুব 'উইক-এণ্ড' ও 'হলিডে' করছেন অর্থাৎ শনিবারে বেরিয়ে যাচ্ছেন কোনখানে, আবার সোমবারে সকালে ফিরছেন; ছুটি হলেই আবার উধাও।

একদিন বাইরে থেকে এসে দেখি—মিস্টার ও মিসেস খুশীতে ভরপুর; আমাকে বললেন : "বলুন তো কি হয়েছে?" আমি বললাম : "নোজি ভাল হয়ে গেছে।" নোজি হ'ল ছোট একটি টেরিয়র কুকুর। মিসেস বললেন : "দূর, এই দেখুন।" আমার হাতে তুলে দিলেন একখানি রেশন বই। দেখি তাতে লেখা 'বেবী অমুক'। আমার খুব আনন্দ লাগছিল; জিজ্ঞাসা করলাম : "আপনাদের বেবী?" মিসেস বললেন : "হ্যাঁ।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম : "কখন জানলেন?" বললেন : "এই তো আজ সকালে। আমি আজ গিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে, পরীক্ষা ক'রে বললেন যে, ব্যাপারটা সত্যি; একটা সার্টিফিকেট দিলেন; নিয়ে গেলাম ফুড অফিসে; তারা কার্ড দিয়ে দিল। ডাক্তার বলল, আর আট মাস আছে বেবীর আসতে।" ওদেশে যখনই জানা যায় কেউ অন্তঃসত্ত্বা, তখনই বেবীর একখানা রেশন কার্ড দেওয়া হয় মা'কে, যাতে মা দেহের অতিরিক্ত যে পুষ্টি দরকার, তা' রাখতে পারে। মিসেস আলমারি খুলে বের করলেন ছ' শিশি কমলার রস, কডলির ক্যালসিয়ম। বললেন, এ সব নিয়মিতভাবে তাঁর নিয়ে আসতে হবে খাওয়ার জন্যে। এ সবই কিন্তু বিনা পয়সায়। সারা ঘরটায় আনন্দ উপচে পড়ছে সেই শিশুকে স্মরণ করে, যে এখনো জন্মায় নি। কুকুরটা এর মধ্যে দৌড়ে এল, মিসেস কোলে তুলে নিয়ে বললেন : "নোজি, আমাদের বাচ্চা আসছে, তুই হিংসে করিস নে। তোকেও আদরে রাখব।"

পরের দিন মিসেস আমাকে বললেন : "আমার মাতৃ-মঙ্গল ধরনের একটা কোর্স নিতে হবে ছ' সপ্তাহের জন্যে, এ কোর্সটা ভাল এবং সকলেই নেয়; এ সম্বন্ধে কিছুই তো জানিনে।" ছ' সপ্তাহের ভেতর দেখলাম, মিসেস রীতিমতো সব কিছু শিখে ফেলেছেন, মায় বেবীদের কম সেলাইয়ের বিশিষ্ট ধরনের ফ্রক তৈরি করা পর্যন্ত। মাসে অন্তত দু'বার ক'রে যেতে হতো তাঁর ক্লিনিকে, সব ফ্রি। দিন ঘনিয়ে আসতে জানিয়ে দিল কোন্ হাসপাতালে তার ছেলেপেলে হবে, জানিয়ে দিল কোন্ সপ্তাহে হবে। সত্যিই, সেই সপ্তাহে একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতেই মিস্টার বলল : "মনিকা আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছে।" আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম : "মেয়ে হয়েছে নাকি?" বললেন : "হ্যাঁ।" তার পর বললেন : "রাত দুটোর সময় ফোন করলাম হাসপাতালে চার মাইল দূরে, দুটো পঁচিশ মিনিটের মধ্যে নার্স এল এম্বুলেন্স নিয়ে, নিয়ে গেল। সকালে ছ'টার সময় টেলিফোন ক'রে

জানাল মেয়ে হয়েছে।" আট দিনের দিন ফিরে আসলেন বেবীকে নিয়ে; বললেন: "তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হয়েছে ক'দিন; আজ থেকে আরম্ভ করছি।" বেবী আকৃতি ও ওজনে কম হওয়ায়, হাসপাতাল থেকে একটা ক্লিনিকের নাম দিয়ে দিয়েছিল, সেখানে তাকে নিয়ে যেতে হবে প্রত্যেক বিষ্যুদবারে আড়াইটেয়। প্রত্যেক বিষ্যুদবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে তাকে নিয়ে গেছেন সেখানে। একদিন পাক শেষ ক'রে ক্লান্ত হয়েছেন, শরীরটেও ভাল নেই; কি করবেন চিন্তা করছেন। আমি বললাম: "কি যাবেন না নাকি?" বললেন: "না গেলে একটা সপ্তাহ নষ্ট হবে, শরীরটা ওর শোধরাবে না।" তার পর কোলে ক'রে বেশ খুশী হয়ে বললেন: "দেখ, ও বেশ ভারী হয়েছে আজকাল; শীগগিরই ওর স্বাভাবিক ওজন পাবে।" তার পর তিন মাস যখন তার বয়স, তখন এসে বললেন: "ওর ওজন স্বাভাবিক হয়ে গেছে, শরীর ঠিক হয়ে গেছে, এবার আর ওর দিকে দৃষ্টি দেবার দরকার নেই।" কথাটার মানে বুঝলাম পরে। এতদিন মেয়েটি কাঁদলে মিসেস নিয়ে তার কান্না মেটাবার চেষ্টা করতেন, কোলে করতেন। এবার থেকে সে-পাঠ তুলে দিলেন। একমাস দেড়মাস মেয়েটা বেজায় কাঁদল। একদিন দেখি, অন্য কামরায় মেয়েটি ট্যা ট্যা ক'রে কাঁদছে, আর মিসেস অস্থির পায়চারি ক'রে একবার দরজার কাছে আসছেন আবার ফিরে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন: "দেখুন, মা হওয়া একটা অভিশাপ; মেয়েটি কেমন কাঁদছে দেখছেন। ওর কান্না শুনলে আমার যে কী অস্থির লাগে সে কী বলব; বুঝি থামকাই কাঁদে, কিন্তু মন বলে না-জানি কত কষ্টই তার হচ্ছে। একবার ইচ্ছে করে যে গিয়ে কোলে করি, কিন্তু ওর স্বভাব নষ্ট হয়ে যাবে, সেই জন্যেই করিনে। উহ্‌ কি দুঃখ লাগে! এর চাইতে ও না হলেই ছিল ভাল।" তার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। আমি কামরাটায় ঢুকলাম, ঢুকে বললাম, "কিরে আম্মি, এমনি ক'রে কেঁদে মাকে ঘাবড়িয়ে দিচ্ছ কেন?" সঙ্গে সঙ্গে খলখলান হাসি দিয়ে সব কান্না তার ঢেকে দিল। বাইরে আসতেই তিনি হেসে বললেন: "দেখলেন তো, কিছু হয়নি, থামকাই অমনি করছে; ও মনে করে ও ভারী বড় হয়েছে, ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। সত্যি ও বড় দুষ্টু হয়েছে—" বলতে বলতে চোখ দিয়ে টসটস ক'রে দু'ফোঁটা পানি পড়ল। তিন মাসের ভেতর দেখি মেয়েটি কান্না একেবারে ছেড়ে দিয়েছে।

একদিন দেখলাম একটি বড় বোতলে দুধ, বেশ পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢাকা; সঙ্গে রয়েছে ফিডিং বোতল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "ওকে গাইয়ের দুধ দেওয়া আরম্ভ করেছেন নাকি?" তিনি বললেন: "না, ও আমাব বুকের দুধ; গেলে রাখলাম, খাওয়াব ওকে।" আমি বললাম: "গেলেছেন কেন?" উনি বললেন: "ওকে যে পরিমাণ খাওয়াতে বলেছে, কম খাওয়ালে চলবে কেন, আর বেশী খাওয়ালে তো অসুখ করবে। সকালে ছটা, দশটা, তার পর দুটো, ছ'টা আর রাত দশটা—এর বেশী তো খাওয়াতে পারব না; কম হলে তো উপোস হবে ওর পক্ষে। তার পর কাঁদা-কাটা করলে জানতে পারব না খিদেয়ই করছে কিনা; শরীর এখন ভাল, দুধটা ঠিক পরিমাণ খেয়েছে জানলে কাঁদার জন্যে পরোয়া করিনে। এই দুধ গেলে খাওয়ানো এ যে কি কথা তা' তাঁরাই জানেন, যাঁরা শীতকালে কোনদিন লণ্ডনে ছিলেন। সকাল ছ'টায় ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে কনকনে শীতের ভেতর উঠে আগুনে তাতিয়ে নিয়ে বসে, দুধ গেলে, তা' গরম পানির ভেতর রেখে গরম ক'রে বোতলে পুরে বাচ্চাকে খাইয়ে আবার শোয়া—এ সব করার মধ্যে ভালবাসার প্রকাশ না পায় তো বলি দরকার নাই প্রকাশের।

এই যে বলে—সব সময় বেবীর দিকে মন দিলে সে নষ্ট হয়ে যায়, এর তাৎপর্য আমাদের দেশে থেকে বুঝা যায় না। এক বাড়িতে গেছি, বেবীদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছে; প্রত্যেকেই দেখি বাহাদুরি নিতে চাচ্ছেন তাঁর বেবী বেশী কাঁদে না বলে। একজন আর একজনকে প্রশ্ন করলেন: "তোমার বেবী তো কাঁদে না জানি, কিন্তু সেদিন কি ব্যাপার হয়েছিল বলতো, পুলিস এসেছিল?" উত্তরে যা বলল, তা' এই: তাঁর বেবী একদিন কি জানি খুব কেঁদেছিল; পাশের বাড়ীর একজন পুলিসে সংবাদ দেয় যে, হয় সে বেবীকে আহ্লাদ দিয়ে নষ্ট করেছে, নয় তো বেবীর কোন অসুখ আছে, তার চিকিৎসা করাচ্ছে না। এই শেষেরটার জন্যে নালিশও করতে পারে। কারণ, সেখানে ডাক্তার ও ওষুধের খরচ কারও নিজের লাগে না, গভর্নমেণ্ট দেয়; সুতরাং এর গাফলতি অন্যে সহ্য করবে কেন?

বেবী ফালতু আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত হয় দু'তিন মাস বয়স থেকেই। কাঁদতে কাঁদতে যখন দেখে যে, কেউ আসে না, তখন এ রকম কাঁদায় ক্ষান্ত হয়। পথে-ঘাটে, বাড়ীতে কোনখানে, কোন সময়ই কোন ছেলের কান্না শোনা যায় না, অথচ সারা জাতটা মায়ের কোলে কোলে মানুষ হচ্ছে।

বাঁদী-চাকরহীন দেশে, মা নিয়ে যায় বাজার করতে, বায়স্কোপে, বেড়ানোর সময়ে। মা-বাবার বুকে-পিঠে মানুষ হয় তারা।

এবার আপেলাহত শ্রীমানের নানী বললেন: "তুমি মনে কর আমাদের ছেলেপিলেদের অযথা আহ্লাদ দেওয়ায় তারা কাঁদে?" আমি বললাম: "হ্যাঁ।" আরও বললাম: "আজ যদি আপনার ছেলেটির কান্না পাশের বাড়ী-ওয়ালাদের শান্তি নষ্ট করলে তার জন্যে আপনাকে পুলিসের কাছে জবাবদিহি করতে হতো, তো আপনার ছেলেটিও আর কাঁদত না।"

নানী বললেন: "আমি অমনি ক'বে না ধরলে, তুমি মনে করো ও কাঁদত না?" আমি বললাম: "না।" তিনি বললেন: "তুমি মনে কর আপেলটা পড়ায় সে ব্যথা পায়নি?" আমি বললাম: "পেয়েছে কিছু, কিন্তু কাঁদার মতো নয়। সে তো হাসতেই গিয়েছিল।" চটে বললেন: "ব্যথা পেলেই সে কাঁদত, আদরে কিছু হয়নি।" বলে গুম হয়ে বসে রইলেন। এব মধ্যে ছেলেটি তুব তুর ক'রে তাঁর কাছে যেতে তিনি একটু ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন: "যাও যাও, আমার কাছে নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার দরদী এসেছে তার কাছে যাও।" ছেলেটি হতভম্ব হয়ে আমার দিকে আসতে লাগল। আপেলের সত্যানুভূতিব এইবার চবম প্রকাশের অবসর; নির্ভিক নিউটনের মতোই দ্বিধাহীনভাবে অনুভূতিকে পরিবেশন কবতে পারি, তা' দেখতে যতই বিদঘুটে হউক। এইবাবই নিঃসন্দেহে প্রমাণ কবব যে, আহ্লাদ দিয়েই যে-কোন ছেলেকে কাঁদানো যায়। খোদা, শুধু ছেলেটিকে আমার কাছে আসা পর্যন্ত আমার সংকল্প স্থির রেখো। ছেলেটি কাছে আসতেই আমি গদ্গদ হয়ে তাকে কোলে টেনে নিয়ে বললাম: "আহা রে, কে মেরেছে রে।" এমনি ক'রে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতেই হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। আমি মবিয়া হয়ে আরও চালালাম। শেষ পর্যন্ত হেঁচকি উঠে গেল। কোনদিকে না চেয়ে খুশী মনে সিঁড়ি দিয়ে টপকে নেমে একেবারে রাস্তায় এসে পড়লাম। ছেলেটাকে অযথা কাঁদালাম, এটা মনটাকে একটু দমিয়ে দিলেও, নানীর চেহারাটা কি রকম হচ্ছে, সেটা আজমায়েশ ক'বে ভারী খুশী হয়ে উঠলাম।

বড়শি

'বড়শিতে গেঁথে তোমাকে টেনেই তোলা যায়, খেলিয়ে তোলবার মতো বড় মাছ তুমি নও'—এ কথাটা কোন মানুষ মাছকে বলেনি, সাবিত্রী বলেছিল সতীশকে, শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাসে। চার দেওয়া না থাকলেও বহু সতীশ সাবিত্রীদের বড়শিতে গাঁথা পড়ে; সতীশেরা মাছ না হলেও সাবিত্রীরা খেলিয়ে আনন্দ লাভ করে। বড়শিবিদ্ধ মাছকে সুতো ছেড়ে খেলা দেখার অনুভূতি রীতিমতো সমৃদ্ধ অনুভূতি। আর এটা ক্লাসিকেল হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নানা উপমায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

বড়শিতে মাছ ধরতে যে সুখ আমরা পাই, তা' বস্তুতঃ লালা-চাঞ্চল্যের মুহূর্ত স্মরণ ক'রে। ধরার সেই চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় আমরা তাই বসে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নানারূপ আয়োজন চলে পাকড়ানোর; ব্যর্থ ঘণ্টা বয়ে যায়, তবু ক্লান্ত বোধ করিনে। কবির রঙীন আকাশের দিকে চেয়ে থাকার মতোই এই বসে থাকার একটা মোহ আছে, ছিপ হাতে নিয়ে বসেছেন কি বাইরের জগৎটা আপনার কাছে লুপ্ত হয়ে যাবে; মাছের যে জগতের সন্ধান আপনি পাবেন তাতে দেখবেন বড়শি বাওয়াটা শুধু একটা স্পোর্ট নয়, এর ভেতর আছে পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা। মোগলাই যুগে পর্দানশীন হাতের নাড়ী দেখা হতো তাঁদের হাতের কব্জিতে সুতো বেঁধে, সেই সুতোতে নাড়ীর গতির স্পন্দন উপলব্ধি ক'রে। বড়শির ব্যাপারটাও তাই। পানির নিচে পর্দানশীন মাছদের নাড়ী-নক্ষত্র আপনি ঠিক পাবেন টোমের নাচুনির ছন্দে।

আপনার বড়শির টোপে ঠোকর পড়েছে—হালকা খৈ-নাচুনি ঠোকর। ঠোকরের রকম দেখে যে ছন্দটা আপনার মনে এল তা' হ'ল—টরে-টরে-টরে। সঙ্গে কিছু বুদ্বুদ-ও উঠল—ঠিক পেলেন কচ্ছপ। ছিপটা ছাড়িয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি। কাতলের ছন্দ হ'ল—টরে-টরে-টক্কা, অর্থাৎ হালকা, ছুটো ঠোকর দিয়েই টোপ নিয়ে পাশের দিকে ভোঁ দৌড়। রুইয়ের ঠোকরে কিন্তু জাঁদরেলি ভাব আছে, মাছের রাজা কিনা। তার ঠোকর আসে এই ছন্দে: টক্কা-টক্কা-টটক্কা-আ, অর্থাৎ জোরে দু'চারটে ঠোকর দিয়ে টপ ক'রে নিয়ে

যাবে নিচের দিকে। মাছের আগমনী আপনাকে প্রথম ঠোকর থেকেই উত্তেজিত ক'রে রাখবে। কি মাছ তা' যদি আপনি ঠোকর থেকেই ধরতে পারেন, তবে ছিপের টানটার আপনি তাল রাখতে পারবেন। এই তাল কাটলেই মাছ পালাবে। টোম পুরোপুরি তলিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর, উল্টো টান দিয়ে যে মাছ গাঁথা তা' নিতান্ত মামুলী; আনাড়ীর পক্ষে তা' আনন্দপ্রসূ হতে পারে বটে, কিন্তু যিনি ওস্তাদ, তিনি ওকে বন্দুক দিয়ে বক মারার শামিলই মনে করবেন।

ছিপে মাছ ধরার চরম মুহূর্ত বা supreme moment হ'ল তখন, যখন গাঁথে বড়শিতে। উল্টো একটা টান, একটু বাধা, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁও-ও-ও ক'রে উঠল হুইলের মধ্যে সুতোর কাঁদুনি, আপনি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেলেন; মাছ চলে গেল মধ্য পুকুরে। অর্জুনের লক্ষ্যের মতো পক্ষী অদৃশ্য হয়ে গেছে আপনার, মাছ দেখছেন শুধু, বাধা পেয়ে মাছ দাঁড়ায়, আপনার প্রভুত্বের প্রথম আনন্দ উপলব্ধি করেন আপনি। ধীরে ধীরে টানেন আর ছাড়েন। যদি মাছকে এর মধ্যে দেখে চিনতে না পেরে থাকেন, তবে তার খেলার মধ্যে আপনার চিনতে দেরি হবে না। রুই মাছটা ভদ্রসন্তান বলে শীঘ্রই কাত হয়ে পড়ে। কেলির বিলাস তার নাই। মৃগেল মাছই খেলোয়াড় ভাল; রসিকতা-বোধও তার বেশী। দেখলেন নিরীহের মতো সুতোর টানের সঙ্গে আসছে; আপনি একটু অপ্রস্তুত হয়েছেন কি দিল উল্টো দিকে এক দৌড়। মাছটা ঘাটের কাছে এসে কাত হয়ে পড়লে—অনেক ক্ষেত্রে ঝুড়ি দিয়ে তোলা হয়। এই তোলার রীতিটা এখনো প্রথম শ্রেণীর বড়শি বাইয়েদের অনুমোদন লাভ করতে পারেনি, কারণ এতে আর্ট তেমন নেই।

বড়শি ফেলে বসে থাকার আনন্দের পূর্বেও আনন্দ আছে, তা' হ'ল বড়শি ফেলার জন্যে নিজেকে তৈরি করার আনন্দ; চার তৈরি, বড়শি বাছাই, সুতো তৈরি, এগুলোতেও ওস্তাদি কম নেই।

যাদের একাধিক বন্দুক আছে তারা যেমন বিভিন্ন শিকারে বন্দুক বাছাই ক'রে থাকেন, বড়শিওয়ালারাও তেমনি বড়শি বাছাই করেন। তাঁদের কোন কোন বিশিষ্ট ছিপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে। মনের মতো ছিপটিকে নিয়ে বাতাসেব মধ্যে শোঁ শোঁ ক'রে ঘুরিয়ে পরম মায়ার সঙ্গে বলেন: "এটা আমাকে কখনও নিরাশ করেনি।"

চার তৈরি ব্যাপারটাও কম আনন্দদায়ক নয়। রুটি, খৈল, মেথি,

একানী—এই দিয়ে হয় সাধারণ চার। কিন্তু যাঁরা গুণী তাঁরা আবার নিজস্ব ফরমুলা সংযোগ করেন। এই ধরুন কেউ দিলেন ছোপ, কেউ মিষ্টির গাদ। নিত্য নব 'অনুশীলন' চলে এই চার তৈরির ব্যাপারে। অনেকেই আছেন যাঁরা ছিপে মাছ ধরেন না, অথচ ফরমুলা-দানকারী হিসেবে তাঁরা প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে চার নিয়ে আলোচনা অনেক সময় পরচর্চাব চাইতেও সুখকর মনে হয়।

জালে মাছ ধরা বা কোঁচ দিয়ে মাছ মারা, বড়শি বাইয়েদের কাছে বীভৎস মনে হয়, যেহেতু ওর মধ্যে খাওয়াব প্রেরণাই মুখ্য। ডাঙায় তোলার পর বড়শি বাইয়েদের কাছে মাছে আর কোন আসক্তি থাকে না। সেই জন্যে ওস্তাদ ব্যক্তিরা চারকাঠি দিয়ে মাছ মারাটাকে হীন বলে মনে করেন। বাঁশের মধ্যে ফাঁক চিরে, চিঁড়ে, মুড়ি, কলা একত্রে চটকে তাব ভেতর দিয়ে সেটাকে গেড়ে দেওয়া হয় পানিতে, এই হ'ল চারকাঠি। চারকাঠি দিলেই মাছগুলো পাগল হয়ে যেন তার চারদিকে ঠোকরাতে থাকে ; তখন টোপহীন বড়শি দিয়েই তাদেরকে ধরা যায়। আমার কাছে এটা অনেকটা অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি—hitting below the belt.

মাছধরা এমনই মজার যে, এর আগাগোড়াই একটা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে পারে। সারাদিন বসে থেকেও যদি একটা মাছ না ধরে, তাতেও পরোয়া নেই। কিভাবে ঠোকর দিয়েছিল, কিভাবে টান দেওয়ায় তা' গাঁথেনি, কিভাবে টান দিলে তা' গাঁথত—এসব কল্পনা-জল্পনা ক'রেও বাড়ী ফিরতে কি আনন্দ। মাছ গেঁথে যদি ছুটে গিয়ে থাকে, তবে তো কথাই নাই। নিশ্চয়ই সেটা পুকুরের সব চাইতে বড় মাছ। "ছিপটা কিরকম বেঁকে গিয়েছিল দেখেছ? আজকে ওকে চিনলাম, আগামীকাল বাছাধনকে ধরব।"—এমনি কত কথা আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলি। বড়শি বাওয়ার মধ্যে পুরনো দিনের শিভালরীর মতো কতকগুলো শিষ্টাচার আছে। ধরুন যেমন অন্যের পুকুরে কেউ কেঁচো দিয়ে মাছ ধরেন না, যেহেতু লোকের বিশ্বাস কেঁচোতে মাছ ধরে বেশী।

আমি বড়শি বাওয়াটা পছন্দ করি এক কারণে সব চাইতে বেশী। সেটা হ'ল বড়শির ছিপ ধরলেই আমি একেবারে স্বাধীন হয়ে যাই। অসুখ-বিসুখের সময় বাদে প্যাচাল থামাতে পারি নে, ভাল দুটো কথা বলার সময় যারা অহেতুক ফোঁড়ন দেয়, 'চ্যাটার বক্সের' মতো যারা অনর্গল কথা বলে যায়,

তাদের ঠেকানো যায় এই ছিপ হাতে ক'রে। ছিপ নিয়ে বসে পড়ুন, চিন্তা করুনরাজ্যের যত প্লট। কেউ আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করতে আসবে না; যদি রইবে। কেউ আসে, আপনি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে একটু হুস-হুস করলে সে শান্ত হয়ে এজন্যেই বড় বড় বিলেতী নেতারা সপ্তাহের শেষে বড়শি বাওয়ার নাম ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন।

আমি খানদানী বড়শি বাইয়ে নই যে ঘণ্টাকে ঘণ্টা বসে থাকব মিকোয়াবরের ফিলজফি নিয়ে—something will turn out at last. কৈ, চেলা যাদের দ্রুত ধরা দেওয়ার অভ্যাস আছে, তারাই আমার ধৈর্যকে নষ্ট ক'রে দেয়; অন্য পরে কা কথা। এই যে দশ মিনিট আমি বড়শি বাইতে পারলাম, তা' শুধু রেডিওর কল্যাণে।

আত্মপ্রশংসা

চা পার্টির মধ্যে সব সময়ে দু'একজন লোক পাবেন, যারা নাকি বেশ চালিয়াত এবং চালিয়াত্তির দ্বারা সারা পার্টির লোকগুলোকে তটস্থ রাখে। দু'একটি বিচক্ষণ লোক যদি এক-আধটা মোক্ষম কথা দিয়ে তাদের এমনিভাবে বসিয়ে দেন যে, বাকী সময়টা তারা আর ঐ সময়ের ঘা কাটিয়ে উঠতে পারে না, তা' হলে তা' হয় সারা পার্টির পক্ষে এতই আনন্দদায়ক যে, কথার আঘাত হানার চরম মুহূর্তে ভদ্রতাবিরোধী হলেও শ্রোতারা চীৎকার ক'রে বলে ওঠে 'চমৎকার'।

তেমনি হ'ল একবার। এক মহাত্মা এল। পরনে করডুরয়ের প্যাণ্ট, গায়ে গ্যাবার্ডিনের জ্যাকেট, সিল্কের হালকা ছাই রঙের শার্ট, জলজলা চক্কর দেওয়া সাটিনের টাই, জুতোটা পুরু সোলের। সে ঢুকতেই সারা পার্টিটায় মধুর চাকের গুঞ্জন ও লীলা-চাঞ্চল্য পড়ে গেল।

বেশ বড় একটা টেবিল ঘিরে বসা, দাঁড়ানো, আধ-বসা, আধা-দাঁড়ানো অবস্থায় একটা জটলা তার চারপাশে পাকাল। মুভী ক্যামেরার লেন্সের মতো তার চোখ দুটো প্রত্যেককে দেখে দেখে ঘুরছে। সুবিধেমতো একজনের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে, চট ক'রে নিজের টাইটা দেখিয়ে বলল: "ও, এইটা দেখছ? তা' এটা এখানকার নয়। এটা ইটালী থেকে আমার এক বন্ধু পাঠিয়েছিলেন।" সকলে জানে, এসব তার চালিয়াতি। সে-ই হয়তো ঢা'ার কোন দোকান হতে কিনেছে, নয়তো কারো কাছ থেকে গাপ মেরেছে। বহুবার এমনি চালিয়াতি করতে ধরাও পড়েছে, কিন্তু নির্বিকার। সে মওকা পেয়ে বলে চলল: "আজকে বেশ মজাই হয়েছে দেখছি। এই যে করডুরয়ের প্যাণ্টটা দেখছ, এ তো তুমি জান হামিদ পাঠিয়েছিল আমেরিকা থেকে।" ব'লে একজনের দিকে চাইল। সে, খোদা মালুম, কিছু জানে বলে মনে হ'ল না।—"আর এই জ্যাকেটটা উপহার দিয়েছিল আমার এক নাইজিরিয়ান বন্ধু ওগলুডন। এবার কলকাতায় আলাপ। ভারী বন্ধুত্ব হয়ে যায়, দু'দিনে।" এইবার একজন একটুখানি নেওয়ার জন্যে বলল: "তা' হলে বলো বহু চিঠি লিখেছে তোমার কাছে। আমার ছেলেটির আবার স্ট্যাম্প সংগ্রহের

বাতিক, নাইজিরিয়ার টিকেটের জন্য সে তো পাগল। তোমার কাছে যাক একদিন!" মহাত্মা কিছুটা অপ্রস্তুত হ'ল যেন। তার পর চট ক'রে বলল: "পুওর সোল। চিঠি লেখার কি আর অবকাশ হয়েছিল তার? সেদিন যে জেট-বিমানটি 'ক্রাশ' করল, তাতে সেও ছিল। বেহেস্তের টিকেট সংগ্রহ করতে চাও তো না হয় একটা চিঠি লিখি, তার উত্তর পেলে—" বলে খুব হাসল। অন্যেরাও যোগ দিল। মহাত্মা একহাত নেওয়ায় আপাতত সবাই কিছু দমে গেল। একজন বলল: "তা' হলে বলুন জুতো-জোড়া ও শার্টটাও অন্যের দেওয়া উপহার। "মহাত্মা হেসে বলল: "একেবারে ঠিক কথা"—বলে একটি বিদেশী ও একটি অর্ধ বিদেশীর নাম করল। হঠাৎ হোহো ক'রে হেসে বলল: "বাই জোভ, এমন হয়নি কোনদিন, এই দেখ, এই মোজা জোড়া পর্যন্ত উপহার পাওয়া। শুধু গায়ের চামড়াটি আমার।"

একটি লোক এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিল, এবার চট ক'রে বলল: "ওটাও তোমার নয় ভায়া, ওটা গণ্ডারের।"

সবাই হেসে উঠল। বলল: "Perfect beauty, চমৎকার।"

শুনলেন গল্পটি এবং আপনিও নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পেলেন। এবার যদি বলি যে গল্পটি সত্যি, এবং গণ্ডারের চামড়ার কথা আমি নিজেই বলেছিলাম, তা' হলে?…

তা' হলে আপনি যেন কিছু অপ্রস্তুত হবেন, বলবেন: 'ইস, নিজের কথা ভদ্রলোক বেশ ফলাও ক'রে বলছেন।' কথাটা সত্যি ও সুন্দর হলেও আপনার কাছে তা' গ্রহণযোগ্য হবে না।

বস্তুতঃ আত্মপ্রশংসা ব্যাপারটা খুবই কঠিন। এমন কি ধরুন আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে শাড়ী কিনতে গিয়েছেন। একখানা শাড়ী বেশ চমৎকার ডিজাইনের, আপনার স্ত্রী ফিসফিস ক'রে বললেন: "ধেৎ, আমার ফরসা রঙের সঙ্গে এই হালকা রঙ তো মানাবে না।" আপনি অপ্রস্তুত হবেন না তিনি নিজেকে ফরসা বলায়? নিশ্চয়ই। অথচ আপনি নিজে কতজনের কাছে আপনার স্ত্রীর সৌন্দর্যের গল্প করেছেন। আপনার স্ত্রী যদি ও না বলে বলতেন: "দূর ছাই, আমার এ ফ্যাকাসে চেহারার সঙ্গে ওটা কি খাপ খাবে?" তখন আপনিই বলতেন: "কি যে বলো? ফ্যাকাসে কোথায়? বলো ফরসা রঙ।"

আমরা আত্মপ্রশংসা যতই অপছন্দ করি, এটা ঠিক যে, আত্মপ্রশংসা আকছার হচ্ছেই।

কেন আমরা আত্মপ্রশংসা করি? করি এই জন্যে যে, আমরা নিজেব বুদ্ধি দিয়েই আমাদেরকে বুঝি। বুদ্ধি জিনিসটা ধার করা যায় না। অবশ্য অন্যের সাহায্যে বৃদ্ধি করা যায়। যখন একটা কাজ করি বা কথা বলি, তখন যদি সেটা আমার নিজের কাছে মোক্ষম বলে মনে হয়, তা' হলে আর রেহাই নেই, সেটাই হয় আমার কাছে চরম জিনিস, অদ্ভুত সুন্দর। সেটাকে খাটো ক'রে দেখার বুদ্ধিই থাকে না, সুতরাং সেটার গল্প না ক'রে পারিনে। ধরুন, আমি নুরুল মোমেন, আমার যে লেখা আমার কাছে চরম মনে হয়েছে, সেটা যখন আমার বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করব, তখন আর খাটো মনে হবে না, কাজেই সেটার সম্বন্ধে বলার আকুলির আর অন্ত থাকবে না। কিন্তু ধরুন, আমি হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেলাম,' বুঝলাম লেখাটা যেরূপ হওয়া উচিত ছিল তা' হয়নি, তাই সে সম্বন্ধে নিজের প্রশংসা চেপে গেলাম। এতে বলতে চাচ্ছি না যে, রবীন্দ্রনাথ হিসেবে আমি নুরুল মোমেনের চাইতে ভাল লিখবই, বলতে চাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ হিসেবে আমি নুরুল মোমেনের চাইতে অন্য রকম লিখব, সুতরাং নুরুল মোমেন হিসেবে আমার যে লেখাটা আমি গর্বের মনে করি, রবীন্দ্রনাথ হিসেবে তা' করব না হয়তো; মনে করব লেখাটা আরও উন্নততর হতে পারত। সুতরাং সে-সম্বন্ধে গল্প না ক'রে চুপ ক'রে যাব। আর আমার যে লেখাটা ভাল লাগবে না, সেটার সম্বন্ধেও গল্প করব না। তা' হলে মোটের উপর আত্মপ্রশংসার মৌকা থাকবে না। কিন্তু তা' হয় না তো। তাই আত্মপ্রশংসা থেকে কারও রেহাই নেই। যদি কেউ না করে, বা কম করে, বুঝবেন, তা' হয় শুধু মৌকার অভাবে।

দেখুন না, প্রভুরা, ভক্ত বা মুখাপেক্ষীর সামনে যখন ইচ্ছা যথা ইচ্ছা আত্মপ্রশংসা করেন। তা' করেন এই জন্যে যে, ভক্ত বা মুখাপেক্ষীদের শ্রোতা হিসেবে যে মনোযোগী পান শুধু এই নয়, প্রভুর কথার ভিতর অবাক হওয়ার জন্যে যত কিছু থাকে তার উপর তারা আরও অবাক হয়ে প্রভুকে পর্যন্ত অবাক ক'রে ছাড়ে। আত্মপ্রশংসা প্রভুর কাছে তখন একটা স্পোর্টস হয়ে দাঁড়ায়, এবং করার সচ্ছলতা থাকে বলেই সেটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

প্রভুরা হলেন ব্যতিক্রম। স্বাভাবিক মানুষের চরিত্রেও দেখি এই আত্মপ্রশংসার প্রবৃত্তি দৃঢ়ভাবে নিহিত রয়েছে।

আত্মপ্রশংসা যখন আমাদের না করলেই নয়, তখন আমাদের শিক্ষা

করা উচিত, কি ক'রে তাকে উপাদেয় ক'রে পরিবেশন করা যায়; তা' হলে সমাজের আনন্দ অনেকটা বাড়বে।

দেখুন, যদি একটি চার পাঁচ বছরের বাচ্চা এসে আপনাকে বলে, সে রাস্তায় একটি দৈত্য মেরে এসেছে, তখন আপনি তাকে তারিফ করবেন। অসম্ভব কথায় আত্মপ্রশংসার চরম ক'রে ছাড়বে, তবু আপনি খুশী হয়ে সেটা গ্রহণ করবেন। কিন্তু সেই ছেলেটি যখন পরিণত যুবক, তখন যদি বলে, 'জানেন আমি ক্লাসে প্রথম হই, মাস্টারেরা বলেন আমি নাকি আদর্শ ছেলে' তখন এই কথাটা সত্যি হলেও গ্রহণ করতে আপনার বাধ বাধ ঠেকবে। কারণ হচ্ছে ছোট থাকাতে আত্মপ্রশংসার যে অবাধ লাইসেন্স আপনি দিচ্ছেন, বড় হলে সেটাকে সঙ্কুচিত ক'রে ফেলবেন। কারণ বড় হলে আপনি তার কাছ থেকে মাত্রাজ্ঞান ও রুচি আশা করবেন, আর করবেন তার কথাগুলো যেন শ্রোতার মনে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সূচনা করে, এই।

সুতরাং আত্মপ্রশংসা অন্যের গ্রহণযোগ্য করার মধ্যে চাই আর্ট সৃষ্টি করার সূক্ষ্মতা, ঠিক যেমনি ক রে সে-সব প্রয়োগ হয় গল্প ও প্রবন্ধকে গ্রহণীয় করতে।

প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে মাত্রাজ্ঞান। লক্ষ্য রাখতে হবে মানে, মাত্রাজ্ঞান থাকলে গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, কিন্তু মাত্রাজ্ঞান না রেখেও তাকে গ্রহণযোগ্য করতে পারে সত্যিকার গুণী যারা। একটা পুরনো ঘটনা বলছি। এক ভদ্রলোক বললেন: "আমার স্ত্রী যা চা বানান, সকলে সে চায়ের জন্যে পাগল।" আত্মপ্রশংসা করলেন (যদিও স্ত্রীর মারফতে), কিন্তু মাত্রার ভিতরই রাখলেন। অবশ্য একজনের কাছে (যে রকম হয় এসব ক্ষেত্রে) কথাটা ভাল লাগল না। তাই সে একটু কেটে জিজ্ঞাসা করল: "এক আধজন পাগলের নাম শুনি তো?" ভদ্রলোকটি অম্লান বদনে বললেন: "বাংলার গভর্নর। তিনি রোজ এসে চা খেতেন।" এবার মাত্রাজ্ঞানের বাইরে চলে গেল, সকলে ফেলে দিল কথাটা; বলল: "গুল।" একজন বলল: "কলকাতায় গভর্নর রোজ সকালে বেরুলে ট্রাফিক পুলিসের সাড়া পড়ে যেত। সেরকম তো দেখিনি, এ কোন্ জায়গার ঘটনা হে?" ভদ্রলোকটি হেসে বলল: "রাঁচির!" সকলে সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল। এই ছিল তাঁর আত্মপ্রশংসার আঙ্গিক। মাত্রাকে তিনি ছেড়ে যেতেন প্রথম ঠেলায়, তার পর হাস্য-রসের মধ্যে ফিরে আসতেন মাত্রার ভিতরে। এবং

এই ফিরে আসাটা একটা বিস্ময় উদ্রেকের ঢঙে হতো। তাই আমরা উদগ্রীব হয়ে থাকতাম তাঁর আত্মপ্রশংসা শোনার জন্যে।

এবার রুচির ব্যাপারটা দেখুন। আমার এক বন্ধু তার এক বন্ধুর সঙ্গে খাচ্ছেন। বন্ধুর বন্ধুটি খুব উচ্চবংশের। সে কথায় কথায় বলল : "আমাদের বংশ জান তো খুব উঁচু ; কিন্তু আমার ভিতর সে জন্যে কোন গরিমা নেই। নিম্ন বংশের যারা, তাদের সঙ্গেও আমি দোস্তি কারি, খাই-দাই। এই তো তোমার সঙ্গে করছি। দেখছ কোন আত্মগরিমার লক্ষণ?" রুচির অভাবে এটা অগ্রহণীয়। আত্মপ্রশংসার বেলায় যে রুচি রক্ষা করার কথা বলছি, সেটা কিন্তু নৈতিক রুচি নয়। কুরুচি এ-ক্ষেত্রে হ'ল কথাটা উপস্থিত শ্রোতাদের মনোবৃত্তির উপর বিপরীত আঘাত করার প্রবৃত্তি। নইলে, উপস্থিত মজলিসে সকলে যার উপর বিরূপ, এরূপ অনুপস্থিত লোকের সম্বন্ধে আলোচনা, তা' যতই আত্মশ্লাঘা ও কুরুচিপূর্ণ হোক না কেন, সকলের কাছে নিতান্ত উপাদেয় বলে মনে হবে।

আত্মপ্রশংসা গ্রহণ করানোর মূলমন্ত্র হচ্ছে, সেটাকে শ্রোতাদের অনুকূল ক'রে পরিবেশন করা। উপরের গুণ দুটি কখনো কখনো এর অন্তর্গত হলেও এটা একেবারে অনন্য। পরিবেশনের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জানা নেই কি তার ফল হবে। তবে এটাই হ'ল মুখ্য যে, আপনি যদি আত্মপ্রশংসা করতে চান, তবে এমন কথাও তার সঙ্গে পরিবেশন করবেন, যাকে বলা যাবে আত্মগ্লানির কথা। দেখবেন আপনার আত্মপ্রশংসা সাদরে সকলে গ্রহণ করছে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল বহু আগে কোন মহকুমার কোর্টে যাওয়ার পথে একটি গেঁয়ো হোটেলে। পরিষ্কার কাপড় পরে সকলে যায় মোকদ্দমা করতে, তাই সকলে নিজেকে মনে করে খানদানী। খাওয়া চলছে। হঠাৎ একজন বলে উঠল : "কি পাকাইছ, মুহে দেয়া যায় না! দাম নিবা তো পুরা, বাড়ীতি খাইয়্যা আইলি পারতাম। না, পুরা দাম পাবা না।" অন্য একজন বলে উঠল : "আরে, আপনি তো বালোই, আমরাই মুহে দিতে পারি স্যা।" উত্তরে প্রথম জন বলল : "আপনিই বা কম কি তালুকদার।" উত্তরে তালুকদার বলল : "আর সে কতা এহানে কেডা কয়? বাড়ীতি এমনি পাকাইলি কবিল্যার আড্ডি বাইঙ্গা দিতাম না?" দাম কমানোর জন্যে দেখা গেল প্রত্যেকে এমন কিছু বলছে যাতে মনে হয় তারা নিতান্ত ভদ্রলোক, দায়ে

পড়ে এরকম খানা খাচ্ছে। একজন বেশ খেয়ে যাচ্ছে। হোটেলওয়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করল : "কি মিয়া, আপনি যে কিছু কইলেন না?" মিয়া কিন্তু বেশ শুদ্ধ ভাষায় বলল : "বলবো কি? আমি চাষার ছেলে বাপু। এসব খেয়ে অভ্যেস ছিল।" তার পর যখন দাম আদায় ক'রে বেড়াচ্ছিল দোকানী, তখন দু'এক পয়সা ক'রে সকলে কম দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো দোকানী এক কানা-কড়িও বেরাত দিল না। মিয়ার কাছে আসতেই সে সম্পূর্ণ পয়সা দোকানীর হাতে তুলে দিল। দোকানী সেটা তাকে ফিরিয়ে দিল। সকলে আশ্চর্য হয়ে তাকাতেই দোকানী বলল : "আইজ দশ বছর ধইর‍্যা দোকান করত্যাছি; গরু-চোর ছাখলাম, খুনী ছাখলাম, ক্যাদায় পাও খাইয়া দেছে তাও ছাখলাম, কিন্তুক চাষার ছাওয়াল দেখ্‌লাম না। সগ্‌গলেই ছাখলাম ভদ্দরলোক কওলায়, তালুকদার তালেবার বেক্তি। আজ চাষার ছাওয়াল দেইখ্যা মনডা খুব খুশী অইলো, তাই ওনার পয়সা নিলাম না।"

তার পর জিজ্ঞাসা করল : "আচ্ছা কন তো, 'অব্যেস ছিল' কইলেন ক্যান? এহন খোদায় কি আপনার তরক্কী দিছে?" এবার মিয়া ফাঁদল এমন এক গল্প যেটা আত্মপ্রশংসার চরম—এ তল্লাটে বোধহয় অমনি শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ লোক নেই! কিন্তু সে চাষার ছেলে বলে যে সহানুভূতির বুনিয়াদ তৈরি করেছিল, তার উপর আত্মপ্রশংসার ইমারত বেশ সুদৃঢ় ক'রেই দাঁড় করাতে পারল।

এতক্ষণ বললাম তাঁদের কথা যাঁরা আত্মপ্রশংসা করেন। এবার বলব তাদের কথা যাদের আত্মপ্রশংসা করতে হয়। এ অভ্যেসটা প্রথমে আরম্ভ হয় নিজেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টায়; পরে যখন ব্যাখ্যাটাই বেশ রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠে, তখন ওটা নৈমিত্তিক অনুশীলনে গিয়ে দাঁড়ায়। এবং প্রমাণ দিয়ে আত্মপ্রশংসা এসব ক্ষেত্রে করতে হয় বলে তা' উত্তীর্ণ হয়ও। দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

একবার নারায়ণগঞ্জ থেকে আসছি ট্যাক্সিতে। ড্রাইভার বেশ সাবধানে চালাচ্ছিল, তবু হঠাৎ তার থামতে হ'ল একটা একসিডেণ্ট বাঁচাতে গিয়ে। বেশ মুন্সিয়ানা দেখলাম। তারিফ করতেই সে চট ক'রে বলে বসল : "ওরকম থামিয়ে আমি হরদম প্রশংসা পাই-ই। সে দিন তো একজন পাঁচ টাকা বকশিশ দিয়েই দিলেন।" এটা অত্যন্ত বেশী কথা বলে আমার মনে হ'ল।

সে বুঝতে পেরে বলল : "শুনুন তা' হলে। গাড়ী নিয়ে একদিন চলেছি; রাস্তার ডান ধারে হেঁটে চলেছে একটি লোক, সঙ্গে দু'তিনটি বাচ্চা ও তাদের পিছনে একটি পুরোপুরী ঘোমটা-টানা মেয়েমানুষ। দূর থেকে দেখছি বাচ্চা নিয়ে লোকটি রাস্তার বাম ধারে চলে গেল, মেয়ে-লোকটি কিন্তু ডান দিক দিয়েই চলছে। আমি যখন ঠিক তার কাছে এসে পৌছেছি, তখন সে এক দৌড় দিয়েছে রাস্তা পার হতে। অমনি একেবারে আমার চাকার সামনে এসে পড়ল। আমি কঁ্যাচ ক'রে ব্রেক চেপে থামিয়ে দিলাম। আমার সঙ্গের যাত্রী ভদ্রলোকটি বললেন : 'মেয়ে-লোকটি ঐ মুহূর্তে হঠাৎ দৌড়ে এসে গাড়ীটার সামনে পড়বেই, এই ধারণা নিয়ে না চালালে ব্রেক কষেও তাকে বাঁচানো যেত না। মেয়ে-লোকটি দিব্যি রাস্তার ডান পাশ দিয়ে একাই চলছিল, হঠাৎ অমনি দৌড় দেবে, তা' কি ক'রে মনে করলেন?' আমি বললাম : তার মাথায় ঘোমটাটা টানা ছিল, পুরুষটি যে এ-পাশে এসেছে তা' মোটেই বোঝেনি। গ্রামের মেয়ে, যখনই চোখ তুলে দেখবে, তখনই ঘাবড়িয়ে পুরুষটির দিকে দৌড় দেবে, অন্য কিছু দেখবে না—এ আমি ধরেই নিয়েছিলাম। তাই তার দৌড় দেওয়ার অপেক্ষায় থাকিনি, চেয়ে দেখার অপেক্ষাতেই ছিলাম। যেমনি মুখ তুলে চেয়েছে, অমনি ব্রেক কষেছি। দৌড়-দেওয়া দেখে কষতে গেলে সে ততক্ষণে চাকার তলায় চলে যেত।"

এখানে তার আত্মপ্রশংসাটা হ'ল উদাহরণ দিয়ে, সুতরাং হাতে-নাতে আপনি তাকে পাচ্ছেন এবং তার বাহাদুরিটা যখন বাহাদুরির উপযুক্ত, তখন এটা আপনার কাছে শুধু রসোত্তীর্ণই নয়, রীতিমতো আদৃত হচ্ছে।

আত্মপ্রশংসার শেষের উদাহরণটা আমি নিজের প্রশংসা ক'রেই দিচ্ছি। আমি সুন্দর কবিতা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লিখি। এটুকু শুনে আপনারা বেঁকে বসলেন তো? এবার শুনুন তা' হলে। এই কথাই যাচাই করার জন্যে বি, বি, সি'তে পেয়ারী আপা নাজীর আহমদের সামনেই আমাকে একটি ইংরেজী ছোট কবিতা দিল বাঙলায় অনুবাদ করতে। সময় দিল দশ মিনিট। ক'রে দিলাম দশ মিনিটেই হুবহু তরজমা—কবিতায়। চমৎকার হয়েছে সকলে বলল।

এখন পর্যন্ত আপনারা বলবেন খুব বাহাদুরি হচ্ছে। কিন্তু যদি ইংরেজী ও বাঙলাটা দেই তা' হলে?

ইংরেজী :

In my silent room the moonbeam falls
As soft as thought.
The fire casts its radiance
around the walls.
A star is caught
Up above my window, where
the curtains part ;
As if a dove
Brought white gleamings from
heaven's heart—
A spark of love.

এবার বাঙলা যেটা আমি করেছিলাম

নিঝুম আমার গৃহ তলে চাঁদের ধবল আলো,
ভাবের মতো কোমল, এসে নামে।
চুল্লীর আগুন দেয়ালের গায় সোনা যে ছড়ালো।
চলার পথে একটি তারা থামে
উর্ধ্বে আমার বাতায়নে, যেথা ঝালর গেছে খুলি ;
যেন কপোত নিয়ে-আসা
বেহেস্ত হতে রজত-শুভ্র আলোর ঝিলিমিলি—
এক ফুলকি গভীর ভালবাসা।

মিলিয়ে দেখুন কথা। প্রতি-কথা ইংরেজী-বাঙলা হুবহু এক। দশ মিনিটে লিখেছি মনে রাখবেন। এবার বলুন, এটা বলে আত্মপ্রশংসা করতে পারি কিনা? কিংবা আত্মপ্রশংসা করার জন্যেই এটা বলতে পারি কিনা?

সুপুরুষ লোকটি; আফগানি চেহারা। সুন্দরভাবে কাটা ঘিয়ে রঙের দামী সিল্কের স্যুট পরা। টাইটা যেমন ভাল, তার গিরোটাও তেমন সুষ্ঠু। প্যাণ্টের ভাঁজ রাজমিস্ত্রির ওলনের দড়ির মতো নিখুঁত ঝুলে পড়েছে ডবল সোল সোয়েডের দামী বাদামী রঙের জুতোর উপর।

এ রকম একটা লোক যাকে দেখলে বলতে পারতেন অপূর্ব, কিন্তু বলতে পারছেন না তাঁর চুলে গাড়োয়ানী ছাঁটের জন্যে—এরূপ কখনো কল্পনা করতে পারেন কি?

না, পারেন না। যেহেতু আপনি দেখেন এরূপ লোকটির চুলের ছাঁট সব সময়েই খাপ খায়, চমৎকারভাবে তাঁর স্যুটের সঙ্গে। স্যুটের সৌন্দর্য স্থষ্টির যে তাল, তা' কখনো কাটা পড়ে না চুলের অমানান কাট দিয়ে।

চিন্তা করতে পারেন কখনো এ কি ক'রে সম্ভব হয়? ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই ঐ স্যুট পরে চুল কাটাতে যান নি, গিয়েছিলেন ধরুন শার্ট-পাজামা কিংবা লুঙ্গি পরে। সেভাবে হয়তো খোদা নাওয়াজ কোচম্যানও গিয়েছিল, অথচ ওকে দিয়ে দিল বাবুয়ানা আর খোদা নাওয়াজকে গাড়োয়ানী ছাঁট।

নরানাং নাপিতঃ ধূর্ত—এ কথা সত্যি বলেই ওরূপ সমন্বয়ের তাল কাটে না বলেই এ কথা সত্য।

আমি যাই সেলুনে তখন, যখন বন্ধুরা ক্রমাগত বলতে থাকে: "দেখো, তোমার দিকে তো আর চাওয়া যায় না; হয় চুল ছাঁটাও, নয়তো বাবরি রাখ।" সেলুনে গিয়ে দেখি অনেকেরই আমার অবস্থা। এক এক ক'রে পর্যায়ক্রমে চেয়ারে গিয়ে বসি, নাপিত চুল ছেঁটে দেয় প্রত্যেকের নিজ নিজ রুচি ও মনের মতো। পরিপূর্ণ চুলের ভেতর আগের ছাঁটটা সম্পূর্ণরূপে গোপন থাকে, তাকেই সে মন্ত্রবলে করে উদ্ধার। ঠিক আমি সেই পূর্বের আমি হয়েই ফিরে আসি। বন্ধুরা আমার দিকে আবার চাইতে পারেন।

মানুষকে ভদ্র করার ভার যাদের হাতে, তাদের সবার সঙ্গে তুলনা ক'রে একবার নাপিতকে দেখুন, তা' হলে বুঝতে পারবেন তার কাজটা কত কঠিন। দেখুন দরজী, আপনি যান সেখানে, ক্যাটলগ বের ক'রে ধরবে আপনার

সামনে। বলবে, কি কাট এর ভেতর থেকে আপনি চান? আপনি দেখিয়ে দেবেন, সে সেই অনুসারে কাটবে। ধোপাকেও দেখুন; সে অবশ্য জানে আপনার কোন্ শার্টটার কলারে কলপ বেশী দিতে হবে, কোটটার কি ভাঁজ করতে হবে। তা' পারে এই জন্তে যে, এর পূর্বে আপনি তাকে অন্তত দশবার ধমকেছেন। কিন্তু নাপিত? আপনি কি কখনো পূর্বের ছাঁটা চুলের ফটো তাকে দেখান? দেখিয়ে বলেন, এমনি ক'রে আমাকে ছেঁটে দাও? বলেন না। তবুও দেখুন চুল ছাঁটা হয়ে গেলে কখনো বলতে পারেন না, এটা তো আগের মতো হয়নি।

একবার এক সেলুনে গেছি, বসে আছি বহুক্ষণ। সঙ্গে আমার এক বন্ধু। সামনের চেয়ারে চুল ছাঁটাই হচ্ছে জনৈক ভদ্রলোকের। লোকটি দেখতে যেমন গৌর, স্বাস্থ্যও তেমনি অটল। গায়ে দামী সিল্কের পাঞ্জাবি। দেখলাম তাঁর মাথায় দিচ্ছে অদ্ভুত এক ছাঁট। ছাঁটটা প্রথমতঃ একটি মুষ্টি-যোদ্ধার চেলা চেলা ছাঁট থেকে দ্রুত গুণ্ডা গুণ্ডা ভাব হয়ে আরও নেমে যেতে লাগল, যখন শেষ হয়ে গেল, তখন ভদ্র বলে আর চিনতেই পারা গেল না। উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটা এ-ধার ও-ধার ঘুরিয়ে আরশিতে ভালরূপে দেখে খুশী হয়ে চলে গেলেন। আমরা তো অবাক! আমাদের ভাব দেখে জনৈক ভদ্রলোক বলল: ও হ'ল অমুক মদের দোকানের মালিক—শুঁড়ী। মন বলে উঠল: শুঁড়ী—hate it! কিন্তু নাপিত ঠিক পেল কি ক'রে! আমার মতোই তো বোঝাই করা ছিল চুল তার মাথায়। আমার বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে নাপিত যা জানাল তা' এই: সে তাকে চেনে না, তবে বুঝতে পেরেছিল তার লাল সিনার বোতাম ও বড় রুবির আংটি দেখে। বন্ধু বললেন নাপিতকে: ধর, তোমার যদি বুঝতে ভুল হতো, তা'হলে বলতো কি বিভ্রাট ঘটত! নাপিত হেসে বলল: বিভ্রাট ঘটবে কি ক'রে? উনি তো সব সময়েই দেখছিলেন কি রূপ কাটছি। ঠিক না হলে বলতেন নিশ্চয়ই। এ সব মাথায় আমরা প্রথমেই কাঁচি এমনিভাবে চালাই যে ওরা বুঝতে পারেন আখেরে ছাঁটের রকম কি হবে। আপনারা হলে ওতেই হইচই ক'রে উঠতেন। দেখলেন না কেমন খুশী হয়ে চলে গেলেন। নাপিত আরও বললে, অপেক্ষাকারীদের বাক্যালাপও অনেক সময় তাদের চুলের ছাঁট সম্বন্ধে হদিস দেয়। তা' হতে পারে। কারণ খেয়াল ক'রে দেখবেন যদি কেউ অমন কোন কথা বলেন, যাতে ক'রে তাঁর চরিত্র পুরোপুরিভাবে

প্রকাশ পায়, তা' হলে দেখবেন নাপিত কাজের ভিতরও ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখে নিচ্ছে একবার। তখনই ছাঁটটা তার মনে গেঁথে যাচ্ছে।

আমাদের গুমর ঢেকে চেহারাটা পরিপাটি করতে যারা সাহায্য করে, নাপিত তাদের মধ্যে একজন। আপনাদের মধ্যে যাঁর টাকা আছে তাঁর গুমর ঢাকতে লোকের অভাব হয় না ; কিন্তু যার টাক আছে, তার নাপিত ছাড়া উপায় নেই। সে আপনার টাক ঢাকবেই, পিছনের হলে সামনের চুল দিয়ে, সামনের হলে পিছনের চুল দিয়ে, দু'দিকের হলে পাশের চুল দিয়ে।

কথায় বলে, ব্যক্তিগত স্পর্শ মানুষকে মানুষ বোঝার সাহায্য করে সব চাইতে বেশী। কারণ তাতে বাড়ে মনের উদারতা, বাড়ে বোঝার শক্তি। রাজনীতিতে এক দেশের নেতা যাচ্ছেন অন্য দেশে, মিলছেন সুতরাং বুঝছেন অন্যকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সহজ হয়ে যাচ্ছে তাঁদের সম্বন্ধ।

নাপিতকে আমরা চতুর বলি, কিন্তু তার চতুরতার কারণ আমরা খুঁজেছি কখনো? অদ্ভুত লোক সে! পৃথিবীর যে কোন দেশে আপনি যান না কেন, প্রেসিডেণ্ট-মন্ত্রী থেকে শুরু ক'রে পিওন চাপরাসীর সঙ্গে তার এই ব্যক্তিগত স্পর্শ আছে। সে লাট-বেলাটের মাথায় হাত বুলাচ্ছে, বড় বড় অফিসারদের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে কাজ চালাচ্ছে। থুতু ধরে মুখ তুলে দেখছে যত বিশ্বের নরনারীকে। হ্যাঁ, কানে হাতও যে না দিচ্ছে এমন নয়। কিন্তু কেউ তাতে কিছু মনে করেছে কি? এই সংস্পর্শ তার স্তরের তো দূরের কথা তার চাইতে বহু উর্ধ্ব স্তরের কারো ভাগ্যে জোটে না। এই সংস্পর্শই তাকে দিচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠা, তার ব্যবহারকে করেছে সুষ্ঠু।

বিভিন্ন সামাজিক স্তরের লোকের সঙ্গে পরিচিত হয় বলেই তার বুদ্ধি হয় তীক্ষ্ণ; কাজেই বুঝতে পারে কার মনে কি আকাঙ্ক্ষা। ঠিকমতো চুল কেটে সৌন্দর্য সৃষ্টি করার এই হ'ল নিগূঢ় তত্ত্ব। 'নাপিতের কানে কথা দিলে রাজার কানে যায়'—এই প্রবাদ বাক্যটিও রয়েছে এই নানা স্তরের লোকের সঙ্গে নাপিতের মেশার দরুন। তাই নাপিতের মারফত স্তর বেয়ে বেয়ে কথার ও স্ক্যাণ্ডেলের আনাগোনা চলে। নিভৃতে, প্রত্যেক চুল ছাঁটাইয়ের সঙ্গে, আপনি যদি কিছুক্ষণ নাপিতকে কথা বলার অবকাশ দেন, তবে কিস্তিবন্দীভাবে জানবেন অনেক কিছু।

আমার এক বন্ধু বলল : "দেখ, গাড়োয়ানী চুল ছাঁটাইও নাপিতই করে।" তার উত্তরে অন্য বন্ধু বলল : "দেখ, সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তখনই যখন কোন

জিনিস পাত্রভেদে ব্যক্তিভেদে মানানসই হয়। উর্দি পরলে চাপরাসীকে মানায় ভাল এই যদি হয়, তা' হলে স্যুট তাকে ভদ্র ক'রে তুলবে এ চিন্তা কি তুমি কখনো করতে পার? চুলের ছাঁটের ব্যাপারেও তাই।"

আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি নাকি একটি নবপ্রতিষ্ঠিত সেলুনে গিয়ে চুল ছাঁটিয়ে বাড়ীতে এসে, আরশিতে চেহারা দেখে সেফটি ক্ষুর দিয়ে মাথাটা কামিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি নাপিতের সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতার বিষয়ে হয়তো আপত্তি তুলবেন। তাঁকে আমি এই বলতে চাই যে, বিশ্বের যে কোন কাজে চাই পরস্পরের সহযোগিতা। কাঁধ ছেঁড়া একটি হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে লুঙ্গি পরে, স্ত্রীর চটিজুতো পায়ে দিয়ে যদি কেউ গিয়ে নিরীহভাবে নাপিতেব সামনে আসন গ্রহণ করে, তবে তাকে বিলেত ফেরত না মনে ক'রে যদি এক গাড়োয়ানী ছাঁট দিয়েই থাকে, তবে সেটাকে ব্যতিক্রম বলে ধরাই উচিত। নতুন সেলুনে একটু হুঁশিয়ার হওয়া চাই, পূর্ববর্তীদের কাট কিভাবে ওতরাচ্ছে সেটা দেখে তবে ঢোকা ভাল, কিংবা একাধিক নাপিত থাকলে সেটা দেখে, তবে যাকে দিয়ে কাটাবেন তার চেয়ারটা দখল করা ভাল। সেদিন কি আর আছে, যখন ছিল গলির মোড়ে প্রাইভেট নাপিতের আড্ডা? তারা আসত আপনার বাসায়, জানত আপনার চুলের ইতিবৃত্ত। জানত ছেলেবেলায় আপনার চুল ফেলার অনিচ্ছার কথা। বলতে পারত সর্বপ্রথম কোন্‌দিন দশ-আনা ছয়-আনা কাটে আপনার মন ভুলে ছিল। কখন কিরূপ কাটে আপনাকে মানাত তা' ছিল তাদেব মুখস্থ। তাদের প্রচেষ্টা ছিল চুলের ছাঁটে আপনার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা, আপনাব চেহারাকে সুন্দরতর ক'রে তোলা; শুধু নাপিত তারা ছিল না, তারাই ছিল সত্যিকার নরসুন্দর।

সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা

এবার সূক্ষ্ম স্বার্থপরতার কথা বলব। স্থূল স্বার্থপরতার কথা আপনারা সকলেই জানেন, কারণ প্র্যাকটিস কমিবেশী সবাই করেছেন। আমিও জানি, কারণ আমিও যে না করছি এমন নয়। যখন কোন রাজনীতিক তার ক্ষমতা ব্যবহারে তার শালাকে চাকরি দেন, কোন রাজকর্মচারী তৈল-প্রদান সুখ অনুভূতির জন্যে আজ্ঞাবহ নিম্ন কর্মচারীকে তার কাছে ট্রান্সফার ক'রে আনেন, কোন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে তার আপনজনের প্রতি কোল-টানা ব্যবহার করেন; তখন যে স্বার্থপরতা প্রকাশ পায় তাকে বলা যায় স্থূল স্বার্থপরতা; অর্থাৎ নগ্ন দৃষ্টি দিয়েই বোঝা যায় যে, সেখানে স্বার্থ আদায়ের ঘটা হচ্ছে। এই স্থূল স্বার্থপরতা সমাজের প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন; তার জন্যে মনের কোন সূক্ষ্মভাব দরকার হয় না।

কিন্তু সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা স্বার্থ আদায় বিষয়ে ততটা প্রাঞ্জল নয়, বরঞ্চ আমাদের মনে অবচেতন অবস্থাতেই, তার লীলা-বৈচিত্র্য ঘেঁটে দেখতে হয়। আপনাদের একটা জানা গল্প দিয়েই উপমা দিই। একজনের সঙ্গে আর একজনের দেখা। জিজ্ঞাসা করল : "কিহে, কি খবর তোমার ?" উত্তরে সে বলল : "খবর খুব ভাল নয়, বাড়ীতে দুটো মৃত্যু ঘটেছে ; তবে যদি বলতে হয় তবে মন্দের ভাল বলতে পার ; কারণ ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনলাম, সে মারা গেল—পরের উপর দিয়ে মৃত্যুটা গেল এই যা।" তা' হলে দেখছেন , এ মৃত্যু সে চায়নি—কিন্তু যখন ঘটলই, তখন এভাবে ঘটায় তার স্বার্থের খাতিরে সুবিধে হয়েছে। এই ধরনের স্বার্থপরতাকেই আমি বলি সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা।

এই স্বার্থপরতা আমাদের রোজকার জীবনে হচ্ছে ; তবে মনের অনুশীলন এতে করতে হয় বলে এটা উপলব্ধি করি না। কিন্তু আজ থেকে আপনারা খেয়াল করবেন, দেখবেন একটা নতুন আনন্দ পাবেন এতে। গত পরশু, ধরুন, আমার এক বন্ধু এসে তাঁর মোটরে আমাকে তুলে নিয়ে গেলেন ; খাতির ক'রে পেছনের সিটে আমাকে বসতে দিয়ে নিজে চলে গেলেন সামনে।

বংশালের মোড়ের ওখানে ব্যাক করতে গিয়ে, মোটর পিছনের দিকে ঠোকর লাগাল ট্রাকের সঙ্গে। ধাক্কা বেশ জোরেই লাগল। বন্ধু ড্রাইভারকে হঠাৎ বললেন: "ভাগ্যিস এগুতে গিয়ে লাগাস নি!" দেখুন এখানে; অজান্তিতে বন্ধু প্রকাশ করলেন, ধাক্কাটা যদি লাগেই তবে আমার উপর দিয়েই লাগুক, এই তিনি চান। এই এতক্ষণ যে বললাম সেটা হ'ল 'বাঁচতে হলে নিজেই বাঁচি'—এই মনোবৃত্তি।

এই সূক্ষ্ম স্বার্থপরতার দ্বিতীয় মনোবৃত্তি হ'ল, আপনি নিজে যা পাবেন অন্যে তার চাইতে কম পায় যেন। ধরুন, আপনার পুরো যা দরকার তা' দেওয়া হবে আপনাকে, কিন্তু শর্ত থাকবে আপনাকে যা দেওয়া হবে, অন্যে তার দ্বিগুণ পাবে। আপনি তাতে খুশী হবেন না; বরং আপনি এও চাইতে পারেন, আপনাকে অর্ধেক দেওয়া হোক, অন্যকে দেওয়া হোক তার চাইতেও কম। সেদিন এ সত্যটি অনুভব করলাম, ধানমণ্ডাই-এ আমার এক বন্ধু জমি কিনবে, তার সঙ্গে গিয়ে। বা' কায়দা সব জমিগুলো দক্ষিণ রোখা। দেখে বন্ধু খুশীই হ'ল যেন; কিন্তু পরে মুখখানা মেঘলা ক'রে রইল। আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'কি, ভাল লাগল না?" সে বলল: "হ্যাঁ, ভালই; তবে সব জমিই তো একই রকম।" তার মন বলছে অন্যেরাও যখন ভাল জমিই পাবে, তখন এ জমি পেয়ে খুশী হওয়ার এমনই বা কি আছে? এই মনোবৃত্তির সব চাইতে বিশাল লীলানিকেতন হচ্ছে হল-হোস্টেলগুলো। সেখানে গেলে বুঝবেন ব্যাপারটা। যেদিন মুরগী রান্না হয়, সেদিনকার মনোবিকলন একবার দেখুন: যদি কেউ দেরি ক'রে ফেরে এবং এসে যদি দেখে মুরগী দেওয়া হয়েছে, তা হ'লে হাড় ডানা যাই থাকুক তাতেই সে খুশী। কিন্তু যখন ডাইনিং হলে প্রথমাবস্থায় তাকে পেয়ালা বেছে নিতে হয়, তখনই হয় মুশকিল। রাণের দিকে খেয়াল অবশ্য সর্ব প্রথমেই; কিন্তু যখন অন্য একটা রাণের পেয়ালাও দেখা যায়, তখনই বিপদ। তখন দুটো পেয়ালার মধ্যেই দৃষ্টি দিয়ে মানসিক একটা আলোচনা হয়; "এটায় আছে রাণ ও মাথাটা, ওটায় রাণ ও গলার হাড়। অবশ্য এটা ওটার চাইতে ভাল; হাজার হোক মাথা তো। নাঃ, গলার হাড়টা যেন মোটা মোটা লাগছে, কিছু গোস্তও আছে ওতে।" এই মানসিক অবস্থায় সে হয়তো মাথাওয়ালা পেয়ালাটাই নিল; অন্য একজন এসে নিল গলার হাড় পেয়ালাটি, নিয়ে বেশ উপভোগ ক'রে খেল; তখন মাথাওয়ালার মনটাই

বিগড়ে গেল। ছুটো যখন নিতে পারে না, তখন অন্য একটি নেওয়ার কাতরতা—সেই সূক্ষ্ম স্বার্থপরতারই শামিল।

ছোটবেলায় আমার ছোটভাইয়ের সঙ্গে আমার একটা রফা হয়েছিল যে, যদি কোন জিনিস আমাদের দু'জনের ভাগ ক'রে খেতে হয় তো সে ভাগ করবে আমি বেছে নেব, নয়তো আমি ভাগ করব সে বেছে নেবে। এতে ভাগ যে নিখুঁত ন্যায্য হতো তাই নয়, সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা থেকে একে অন্যকে রক্ষা করতাম। কিন্তু মধ্যে ঢিলে দিয়ে আমি তাকে কুপোকাত ক'রে ফেলতাম; অর্থাৎ সে ভাগ করেছে আমার বেছে নেওয়ার কথা, হঠাৎ বলতাম তুমিই বেছে নাও; তখন সে বলত, "আগে বলনি কেন?" তার সূক্ষ্ম মনটা স্বার্থ-সন্ধানী হয়ে পড়ত হঠাৎ।

এই স্বার্থপরতার তৃতীয় যে পর্যায়ের কথা এখন বলব, সেটা যদিও তেমন সূক্ষ্ম নয়, তবে তার পেছনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথাটা খুব সক্রিয় থাকে না বলেই, একে স্থূল স্বার্থপরতার পর্যায়ভুক্ত আমি করছি না। জিনিসটা যখন একটু ঘোরাল, তখন উপমা দিয়েই বলা ভাল।

জব্বার ও ফৈজদ্দি দু'জন চাপরাসী, একজন টুরিং অফিসারের। ভদ্রলোক ফৈজদ্দিকে বলতেন কমিশনার, জব্বারকে বলতেন হাই-কমিশনার অর্থাৎ ফৈজদ্দি বাজারে গেলে যে কমিশন মারত, তা' জব্বারের মতো তত উচ্চ ছিল না। নিয়ম ছিল, তিনি 'টুরে' গেলে দু'জনই অফিসে গিয়ে হাজিরা দেবে। একবার তিনি টুরে গেলেন, আল্সি ক'রে প্রথম দু'তিন দিন অফিসে কেউ গেল না। পরে জব্বার একদিন ঘুরে এসে বলল: তার যেতে হবে না, সে হেডক্লার্ককে যা বলেছে তাতে তিনি বলেছেন না গেলেও চলবে। ফৈজদ্দিকে বলল যেতে। পরের দিন ফৈজদ্দি এসে বলল: সে যা বলে এসেছে, তাতে হেডক্লার্ক বলেছেন তার না গেলেও চলবে। জব্বার অত্যন্ত কৌতূহল অনুভব করল, বলল: "কি বলে এসেছ ভাই?" ফৈজদ্দি অম্লান বদনে বলল: "বলেছি, জব্বার একটা আসল চোর, তাকে বাসায় একলা রেখে আসি, আর সে চুরি ক'রে সাবাড় ক'রে দিক।" জব্বার খুব হেসে বলল: "আর ভাই, আমি তো তোমার কথায় তাই বলেছিলাম।" গ্লানিহীন মনে দু'জন হাসলে যে তারা অফিস যাওয়া থেকে রেহাই পেয়েছে; চোর বলা না বলায় বিশেষ কিছু আসে যায় না তাদের; অন্যকে ছোট ক'রে নিজের স্বার্থসিদ্ধির মতলব এতে ছিল না; ছিল অফিস

থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে জোরাল একটা যুক্তি। তাই একে সূক্ষ্ম স্বার্থপরতার পর্যায়ে ফেলছি। মন সক্রিয়ভাবে স্বার্থপর না হলেই সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা, কিন্তু এই স্বার্থপরতার মধ্যে আবার মহৎ বৃত্তিগুলো লীলায়িত হয়ে উঠতে পারে, ধরুন যেমন মা'র শিশুকে ভালবাসা। আমাদের এক পণ্ডিত বলতেন, মা শিশুকে ভালবাসেন তার স্বার্থের জন্যে, পেয়ার করেন, তাঁর ভাল লাগে বলে, শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে তিনি খুশী হন। তাই তিনি তার জন্যে করেন। পণ্ডিত জ্ঞানার্জন করেন তাঁর নিজের বাহাদুরির জন্যে।

কথাটা, পণ্ডিতমহাশয়ের ব্যাকরণের মতোই বিশুদ্ধ ও খাঁটি বলে ধরে রেখেছিলাম। তবে বাস্তব উদাহরণ না হলে কোন কথা বদ্ধমূল হয় না, সুতরাং ওটাও হয়নি। কিন্তু কিছুকাল হ'ল একটা ঘটনায় মনে হচ্ছে, এরকম স্বার্থপরতার খাতিরে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দিয়ে দলের খেদমত করার প্রবৃত্তি জাগতে পারে।

কিছুকাল আগে এক চরে বাধল এক দাঙ্গা; দু'দলে চলছে খুব লাঠালাঠি। কেউ কারও সঙ্গে পেরে উঠছে না। এর মধ্যে এক দলের সর্দার ডাকল তার পাঁচ ছেলেকে, ডেকে বলল: "দেখ, তোরা তো বাপের নাম ডোবাতে বসেছিস। আমারও আর আগের দিন নেই যে একাই হটিয়ে দেব সব; যাক, যা পারবি তাই কর, নিয়ে আয় একখানা সড়কি।" ছেলেরা সড়কি নিয়ে এলে সে বলল: "আমার উরুতে বসিয়ে দে; দিয়ে জলদি গিয়ে থানায় খবর দে। মোকদ্দমাটা আঁটুক ভাল। হাতে মারতে না পারিস তো ভাতে মার।" ছেলেরা কথামতো বসিয়ে দিল। কিন্তু উৎসাহের আধিক্য থাকায় বেশ ভালভাবে বসে একটা বড় রগ কেটে গেল; দরদর ক'রে বয়ে চলল রক্ত। বোঝা গেল বাঁচবার আশা নেই। পাঁচ ভাই কাঁদতে লাগল, তা' দেখে সর্দার বলল: "আ মলো! ব্যাটারা কাঁদছিস কেন? এতো আরও ভাল হ'ল; জখমি না হয়ে, একেবারে খুনী মোকদ্দমা হয়ে গেল, ভালমতো চালালে ওদের দু'চারটের ফাঁসি হয়ে যাবে। কাঁদাকাটি করবিনে, বুদ্ধি ক'রে খোদা যে সুবিধে ক'রে দিলেন, তা' পুরো রকম আদায় করবি, বড় গাছেই ঝাঁকি দিয়ে গেলাম, ব্যাটারা কুড়িয়ে খাবি, বুঝলি, কুড়িয়ে খাবি।"

ভৈরবে একদিন

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কুক্ষণে এয়ারো জায়গাটি দেখার পূর্বে ও পরে তাঁর মনের ভাব একটি কবিতায় প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন যে, জায়গাটা দেখার আগে তার সম্বন্ধে তাঁর যা কল্পনা ছিল, দেখার পর তা' খর্ব হ'য়ে গেল। নানা পরীক্ষায় সেই থেকে এই কবিতাটির সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়, মূলে থাকে এর দার্শনিক ব্যাখ্যা : কোন কিছুর সম্বন্ধে দেখার আগে যে রঙীন ধারণা থাকে, দেখার পর তা' আর থাকে না।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কবিতাটি ভাল লিখেছেন বটে, কিন্তু তার দর্শনটি অর্ধসত্য। বাকী সত্যটুকুর কথা এবার শুনুন। একটা জায়গা সম্বন্ধে চাক্ষুস সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ প্রয়াসী হয়ে এবং তার সুউচ্চ ধারণা ক'রে যদি আপনি সেখানে যান, তবে কবির কথাটা হবে সত্য ; কিন্তু যদি আপনার চিন্তাধারাকে আরও অগ্রসর ক'রে মনকে অনুরূপে তৈরি ক'রে সেখানে যান, তবে দেখবেন ভিন্ন ফল ফলবে। বহুদিন আগের কথা। আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তার কোন্ গ্রাম সবচাইতে ভাল লাগে। সে বলল একটি গ্রামের নাম। আমরা বললাম : "সে গ্রামটি তো দেখার আগে তুমি জঘন্য বলে মনে করতে, আর দেখার পরে ভাল লাগল সব চাইতে বেশী! বুড়ো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে তুমি ডুবোবে নাকি?" সে হেসে বলল : "ও-গ্রাম আমার চোখে দেখলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিজেও ডুবতেন। আমরা মানে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল : "মানে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যদি আমার মতো সেখানে বিয়ে করতেন।"

কথাটা হাসির বটে, তবে হাস্যকর নয়। উপমাটা স্থূল হলেও এর মধ্যে একটা দার্শনিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। একটু বিশদভাবে দেখা যাক। ধরুন, পলাশপুর স্টেশন দিয়ে আপনি বারে বারে যাতায়াত করেন। তার সঙ্গে আপনার পরিচয় ঠিক ততটুকু যতটুকু সময় রেলগাড়ী সেখানে দাঁড়িয়ে একটা বাহ্যিক পরিচয়ের অবকাশ দেয়। এবারে ধরুন একদিনের ঘটনা : আপনি গাড়ীতে বসে আছেন সেই পলাশপুরে। একজন গরীব লোক আপনার কাছে সাহায্য চাইল। আপনি বেশ মুরুব্বিয়ানা ঢঙে বললেন : "তোমার তো বেশ

সামর্থ্য আছে হে। তোমার পয়সার দরকার নাই, বুদ্ধির দরকার।" সে উত্তরে চট ক'রে বলল: "কিন্তু স্যার, আপনার যেটা আছে তাই চাইব তো। তাই পয়সা চাচ্ছি।" আপনার সঙ্গে কিছু আগে এই গাড়ীতেই যে ভদ্রলোকটির মনোমালিন্য হয়েছিল, সে হোহো ক'রে হেসে উঠল। আপনি খুব অপ্রস্তুত হলেন।

তার পর হয়তো বছর দুই পরে অন্য কোনখানে হঠাৎ ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে আপনার দেখা হ'ল। পলাশপুরের অপ্রস্তুতির গভীরতা আপনাকে এমনভাবে স্পর্শ করেছিল যে, ঐ মুহূর্তে আপনি পলাশপুরের কথা স্মরণ করলেন। অর্থাৎ পলাশপুরের সঙ্গে একটি সামান্য ঘটনার মাধ্যমে অন্যরূপে সম্পর্কিত হওয়ায় পলাশপুর আপনার নিকট কিছু স্বাতন্ত্র্য লাভ করল।

এবার এই পলাশপুর সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা ধরা যাক: তিন ঘণ্টা ধরে আপনি এই ছোট স্টেশনে গাড়ীতে বসে আছেন। সংবাদ এসেছে, সামনে লাইন ধসে যাওয়ায় আর পাঁচ ঘণ্টা আপনাকে বসে থাকতে হবে। হঠাৎ দেখেন তসলিম মিয়া, আপনার কেরানী সেখানে। আপনি চীৎকার ক'রে উঠলেন: 'আরে তসলিম মিয়া, আপনি কোত্থেকে?" তসলিম মিয়া হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন: "স্যার, ঐ তো লাইনের ওদিকে আমার বাড়ী। চলুন স্যার, খাওয়া-দাওয়া ক'রে ফিরবেন। এখনো পাঁচ ঘণ্টা দেরি।" আপনার পেট ক্ষুধায় চোঁচোঁ করছে। আপনি তৎক্ষণাৎ-ই রাজী হয়ে গেলেন। তসলিম মিয়ার স্ত্রী চমৎকার পাকিয়েছেন; আপনি বারে বারে বলছেন, আর তসলিম মিয়া বারে বারে খুশী হয়ে উত্তর করছেন: "না স্যার, ও বলে আর লজ্জা দেবেন না।" হঠাৎ আপনি ও তসলিম মিয়া আপনারা দু'জনেই চুপ হয়ে গেলেন; মনে পড়ে গেল গত পরশু তসলিম মিয়া 'স্ত্রী ভয়ানক পীড়িত' এই সংবাদবাহী তার দেখিয়ে আপনার কাছ থেকে ছুটি নিয়েছেন। আপনি তার পর হোহো ক'রে হেসে উঠলেন, এবং তসলিম মিয়াকে আশ্বস্ত ক'রে বললেন: "এই দেখুন আমার স্ত্রীও অসুস্থ, এই সেই তার। আমার উপর-ওয়ালাও যদি এমনিভাবে হঠাৎ আমার বাসায় এসে উপস্থিত হন, তবে তিনি এরূপ আপ্যায়নের পর আমার স্ত্রীকে সুস্থ দেখেও আমার অপ্রস্তুত ভাবকে দূর করার জন্য ঠিক এমনিভাবে তাঁর পকেট থেকে স্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ দেওয়া একখানা তার বের ক'রে আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করবেন। আরে, মিথ্যা অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে নির্ঘাত ছুটির একটু বন্দোবস্ত করতে

যদি তাঁরা নাই পারেন, তবে আছেন কেন?" আপনার সঙ্গে তসলিম মিয়াও হেসে উঠলেন।

এর পর দেখবেন পলাশপুর অতিক্রমের সময় শুধু সেটাকে স্টেশন বলে আপনার মনে হবে না। সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ নিয়ে সেটা ঐদিনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গ্রাম হয়ে আপনার মনে স্থান পাবে। মনের পটে দ্বিমাত্রিক স্টেশনের ছবি যেন গভীরতা লাভ ক'রে ত্রিমাত্রিক হয়ে আপনার মনে উদয় হবে। এবং তার মধ্যে দেখবেন তসলিম মিয়া অন্য থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে অনেকটা অন্তরঙ্গতা লাভ করেছে। সুতরাং তসলিম মিয়াকে যখনই দেখবেন তখনই পলাশপুরের সেইদিনের কথাটি মনে হবে। এমন কি আপনি বদলী হয়ে গেলেও তার সম্বন্ধে কোন কথা উঠলে আপনি বলে উঠবেন: "ও, আমাদের পলাশপুরের তসলিম মিয়া?" ঐ ঘটনাটা না ঘটলে হয়তো বলতেন: "ও আমাদের অফিসের তসলিম মিয়া?"

তা' হলে দেখছেন যেটা আগে অদেখা ছিল, সেটাকে আমাদের নিকট আদৃত কিংবা অনাদৃত করতে পাবে শুধু দেখার সময়ে ঘটিত ঘটনাবলীর, আমাদের মনের উপর শুভ অথবা অশুভ, প্রতিক্রিয়া। যাঁরা বন-ভোজনে যান তাঁরা জানেন সাহচর্য ও সহানুভূতি মানুষকে উচ্ছ্বসিত ক'রে পুরনো বাজে জায়গাকেও নতুন ক'রে তাদের কাছে ভাল লাগাতে পারে। তাই বলি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দর্শন পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। মনটাকে যদি ভাল লাগানোর জন্যে তৈরী রাখতে পারি, তা' হলে অদেখা এয়ারোকে দেখার পরও ভাল লাগাতে পারব।

ভাল লাগাটা যখন নিজের মনের কথা, তখন দার্জিলিং না গিয়ে একেবারে ভৈরব যাওয়াই ঠিক করলাম। স্টেশনাতীতভাবে দেখব ভৈরবকে। ভাল লাগার খানিকটা মাল-মসলা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব ঠিক হ'ল, অর্থাৎ যারা আমার সমমনা, তাদের দু'চারজনকে সঙ্গে নিতে হবে ঠিক করলাম। প্রস্তাব করতে যা ঘটে, তাই ঘটল অর্থাৎ বহু বন্ধু যেতে রাজী হলেন: আবার কাজের বেলায় যা ঘটে তা ঘটল অর্থাৎ যাওয়ার সময় দু'জনকে ছাড়া আর কাউকে পাওয়া গেল না। একজন হ'ল আমিনুল ইস্‌লাম, দ্বিতীয় আমি নিজে।

আমিনুল ইস্‌লাম আমার ছাত্র, সহকর্মী ও গুণগ্রাহী। একাধারে তিনটি সুবিধে আমি তার মধ্যে পাই। আমি যদি এটা-ওটা তাকে দিয়ে করাতে

চাই এবং ইশারাস্বরূপ আমি নিজেই করবার ভঙ্গি করি, এবং ক'রে একটু সময় নিতে থাকি, তবে সে চট ক'রে সেটা ক'রে দেয়। আমি বলি : "আহা, তুমি—।" সে বলে : "ঠিক আছে—স্যার।" সেও বোঝে, আমিও বুঝি। এটা হ'ল সে আমার ছাত্র বলে। দ্বিতীয়তঃ যে-সব কথা পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বলা নিতান্ত দরকার, অথচ বলতে বাধ বাধ ঠেকে, সে কথাগুলো ইঙ্গিতের স্বল্প আবরণে ঢেকে তার উদ্দেশে উর্ধ্বে ফেলে দিতে পারি সহজভাবে। সেও তা' মাটিতে পড়ার আগে লুফে নিতে পারে তেমনি সহজেই। এ হতে পারে, কারণ, সে আমার সহকর্মী। তৃতীয়তঃ সে আমার লেখার গুণগ্রাহী বলে এই সুবিধে করতে পারি : অন্যের লেখাকে যৌথভাবে উভয়েই নস্যাৎ ক'রে ক'রে সময় কাটানোটা মনের কাছে শুধু সচ্ছলই নয়, রীতিমতো লীলাময় ক'রে তুলতে পারি। তাই সহযাত্রী হিসেবে অন্যের বিচ্যুতিতে, যখন সে অদ্বিতীয়ম হয়ে দাঁড়াল, তখন তার এই তেহাবা সাহচর্যকে অত্যন্ত কাম্য ও গণ্য ক'রে টিকেটের টাকাটা তারই হাতে তুলে দিলাম।

গন্তব্য হিসেবে ভৈরব, ও চলার পথের স্টেশন হিসেবে ভৈরব—এ দু'য়ের পার্থক্য প্রথম বুঝলাম ক্ষুধার মাধ্যমে। আপনারা যাঁরা ঢাকা থেকে ভৈরব যাতায়াত করেন, তাঁরা জানেন যে, ঢাকা থেকে ভৈরবের দূরত্ব একটি খানার দূরত্ব। অর্থাৎ ঢাকা থেকে খেয়ে রওয়ানা হলে ভৈরব গিয়ে যে ক্ষুধা মিটাতে হয় সেটা হয় বেশ ভারী। ভৈরবে যদি আপনার না নামতে হয় তবে ভৈরবে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাথের খাবার ঠিক ক'রে চায়ের অর্ডার দেন। এবং ভৈরব স্টেশন ছাড়ার পূর্বে সে-সবের সদ্ব্যবহার ক'রে চাঙ্গা হয়ে গাড়ী ছাড়ার অপেক্ষা করেন। কিন্তু যাঁরা ভৈরবে নামেন তাঁরা এই ক্ষুধাটাকে গাড়ী থেকে মিটিয়ে নিয়ে নামেন না। এবং বাড়ী না পৌছনো পর্যন্ত এই ক্ষুধা একটা ব্যতিক্রম হিসেবে তাঁদের মেজাজের মধ্যে ধুঁকতে থাকে। সুতরাং স্টেশনে পৌছনোর আগেই ঠিক করলাম, যদি লোক আমাদের নিতে না আসে তবে স্টেশনেই কিছু খেয়ে নেব। এবং মনে মনে একটু আকাঙ্ক্ষাও করলাম যেন কেউ নিতে না আসে, অথচ এই ক্ষুধাটা অত চাঙ্গা হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত মনে উদ্বেগ ছিল, যদি কেউ না আসে তা' হলে কি ক'রে যাব? যার বাড়ী যাচ্ছি অর্থাৎ যাঁর নাম করলে লোকে চিনবে তাঁর নাম জানিনে, জানি সেই বাড়ীরই একটি ছেলের নাম। গল্প

লেখক হিসেবে আপনারা অনেকেই হয়তো তাকে চিনবেন; কিন্তু সে তো দেশে গেঁয়োযোগী, কতদূর খ্যাতির ভিক্ষে তার গ্রামবাসী তাকে দিয়েছে তা' তো জানিনে, সুতরাং চিন্তা ছিল যদি না চিনি; বাড়ীটার নাম অবশ্য জানি। জানি মানে, জানি মনে হয়। Pelmanic উপায়ে মনে রেখেছি। কিন্তু আমার ছাত্রজীবনে আমার এক বন্ধুর ঠিকানা এই উপায়ে মনে রেখে যে ফল পেয়েছিলাম, তার পর এ পদ্ধতির উপরে আমার আর কোন আস্থা নেই। বাড়ী তার 'বিঘা' গ্রামে। পোস্টাফিস: রামগঞ্জ। স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার সময় আমাকে ঠিকানাটা দেয়। 'পেলম্যানিক' উপায়ে মনে রাখার চেষ্টা করলাম: হাতের পাঞ্জাটা প্রশস্ত ক'রে দিলাম—মনে করলাম হাতের কড়ে আঙুলের মাথা থেকে বুড়ো আঙুলের মাথা, এটা মনে রাখলেই পাওয়া যাবে বিঘা অর্থাৎ দেশী ভাষার বিঘৎ। আর রামগঞ্জ? সে তো খুব সোজা: রাম-লক্ষ্মণ মনে রাখলেই হ'ল। জেলাটির নাম অবশ্য মনে ছিল, কারণ, তখনকার দিনে আমরা ঐ জেলা নিয়ে ঠাট্টা করতাম, এখনো ক'রে থাকি। চিঠি লেখার সময় গ্রামের নাম মনে করার চেষ্টা করলাম। পাঞ্জা তেমনি সম্প্রসারিত ক'রে দিলাম; মনে পড়তে লাগল, 'নয় ইঞ্চি' 'আধহাত'। 'বিঘা' একেবারেই মনে এল না। 'নয় ইঞ্চি' গ্রামের নাম হিসেবে মানানসই মনে হ'ল না। 'আধ হাতটা' দু'চার বার আওড়ানোর পর মনে হ'ল গ্রহণযোগ্য। তবে সরাসরি 'আধহাত' নাম তো আর গ্রামের হয় না: হয়তো হবে 'আধাত'। সুতরাং লিখলাম গ্রাম: আধাত। পোস্টাফিস সোজা: রাম-লক্ষ্মণ মনেই ছিল, তাই বিনা দ্বিধাতেই লিখলাম: লক্ষ্মণপুর। চিঠিটা আর পৌঁছল না। সেই থেকে 'পেলম্যান' পদ্ধতির উপর আমার আর আস্থা নেই।

কেউ না এলে স্টেশনেই কিছু খেয়ে নিতে পারি এই সুখ-চিন্তাটা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্যে বাড়ীর নামটা মনে মনে দোহরাতে গিয়ে ভড়কে গেলাম: জিন্না হাউস? পাকিস্তান হাউস? না পার্টিশন হাউস? 'পেলম্যান' পদ্ধতি আবার ডুবিয়েছে। বাড়ীর নামটি নবরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত—এইটুকুই মাত্র মনে ছিল। কি করা যায় স্থির না করতে পেরে এক কথায় প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে আমিরুল ইস্লাম চেঁচিয়ে বলল: "মিন্নাত আলী এসে গেছে, স্যার।"

এই ক্ষুধারই পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ চমকে শুনলাম মিন্নাত আলী বলছে : স্টেশন হতে বাড়ী প্রায় পৌনে এক মাইল। চলার ক্লান্তির কথা মনে হয়নি, মনে হয়েছে জলযোগের সঙ্গে ক্ষুধার সাম্প্রতিক মিলনের গোলযোগের কথা, খানা-ক্ষুধার বিরহ দীর্ঘতর হওয়ার কথা।

বাইরে এসে রিক্‌শা দেখে এমন বিস্ময় প্রকাশ করলাম যে, মিন্নাত আলী পুলকিত হয়ে হয়তো মনে কবল আমি গ্রামে রিক্‌শা দেখে অবাক হয়েছি। কিন্তু তা' নয়, রিক্‌শা তখন আমার কাছে কুড়ি মিনিট আগে ক্ষুধা মেটানোর প্রতীক। সুতরাং দেখছেন, ক্ষুধার মাধ্যমে নতুন ক'রে কি রকমে ভৈরবকে চিনলাম।

ভৈরব না শহর না গ্রাম। মহকুমা হতে হতে না হলে এবং গ্রাম থেকেও না থাকলে যে অবস্থা হয় একটি স্থানের, ভৈরবের সেই অবস্থা। কলেজ, রিক্‌শা থাকে অনেক গ্রামে; রেলওয়ে কলোনী থাকলে বৈদ্যুতিক আলোও থাকে, সুতরাং ওগুলো ভৈরব থেকে এর গ্রাম্য চরিত্র পরিবর্তন করেনি; কিন্তু ন্যাশনাল ব্যাঙ্কই হ'ল ব্যত্যয়। গ্রামকে বন্দর ক'রে এর গ্রাম্য চরিত্র অনেকটা হানি করেছে। নতুন লোকের দেখা হলে 'ছেলামালাইকোম' দিয়ে সম্ভাষণ এদিকের যে একটা বৈশিষ্ট্য তা' ভৈরব ভুলে গেছে। বরং নতুন লোকদের ইনকামট্যাক্স বা এন্‌টিকরাপশনের লোক বলে সন্দেহের চোখে দেখার একটা ভাব লক্ষ্য করলাম। অর্থাৎ ধোঁকা ও ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টাটা সেখানে শহরের লেভেলে উঠেছে।

সন্ধ্যার ঠিক আগে বেরুলাম। একটু দেরি ক'রেই বেরুলাম। দেশবিদেশ ঘুরে এটুকু বুঝেছি যে, কারও অতিথি হলে এবং তাঁকে নিয়ে বেরনোর ইচ্ছে থাকলে একটা কথা মনে রাখতে হবে: আমার একটা জিনিস দেখার যে আগ্রহ, তাঁর সে আগ্রহ থাকতে পারে না; কিন্তু তিনি কখনো কখনো এই দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখেন এবং আনন্দ পান। সেটা নির্ভর করে তাঁর পক্ষে যোগ্য সময় ও পরিবেশের উপর। ধরুন, কোন অতিথির দিন ছুটোর সময় পানিপথের যুদ্ধ-ক্ষেত্র দেখার অত্যন্ত ইচ্ছে হতে পারে, কিন্তু তিনি যাঁর অতিথি, তাঁর তো এটা ঐ সময়ে দেখা বাস্তিকের শামিল ধরা হবে। জ্যোৎস্না রাতে বসন্তের ফুরফুরে হাওয়া বইলে হয়তো তিনি মনে করতে পারেন একবার ঘুরে আসা যাক মাঠটা। সুতরাং তাঁকে নিয়ে বেড়াতে হলে যেমন সময় তাঁর বেড়াবার পক্ষেও সুগম, তেমন

সময়ই বেছে নিতে হয়। সুতরাং ঠিক সান্ধ্য-ভ্রমণের সময়েই সকলে বেরুলাম।

বেরনোর প্রাক্কালে শুনলাম প্রিন্সিপাল সাহেবকে এবং অন্যান্য কয়েকজনকে আমাদের আসার কথা পরোক্ষভাবে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বেরিয়ে দেখা গেল এই পরোক্ষভাবে খবর দেওয়াটা সার্থক হয়নি। পরোক্ষভাবে খবর দেওয়ার ব্যাখ্যা করতে হয়। ভৈরব যদি পুরনো কেল্লাওয়ালা কোন রাজধানী হতো, তা' হলে প্রবেশ-তোরণ নির্মাণ হতো ঠিক মিন্নাত আলীদের বাড়ীর সম্মুখে। সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গে ভৈরবের সংযোগ রাখতে এটাই হ'ল রিক্‌শার গতিবিধির নাভিকেন্দ্র। সংবাদ দেওয়ার পদ্ধতি হ'ল এই: মিনিট খানেক বাড়ীর সামনে কেউ দাঁড়ায় এবং পরিচিত রিক্‌শাওয়ালা দেখলে জিজ্ঞাসা করে কোন্ দিকে যাচ্ছে; তার পর গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে বলে, অমুককে এই কথাটা ব'লো। এই জায়গা দিয়ে এত রিক্‌শা চলে এবং এত রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে তাদের পরিচয়, যে ভাঁটিতে এই বাড়ীর সামনে বসে কেউ যদি উজানে এক মাইল দূরবর্তী বাজারের কাছে বসা কারও সঙ্গে কথার আদান-প্রদান করতে চায়, তবে রিক্‌শা যাতায়াতের মাধ্যমে পিংপং বলের মতো কথা বিনিময় করতে পারে। বিনা সুতোর মালার মতো একে বিনা তারে টেলিফোন বলা চলে।

কারও সঙ্গে যখন দেখা হ'ল না, তখন বিকেলটা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে আমাদের মনকে অনেকটা স্বাধীন ক'রে দেওয়ায় পরম পুলকিত হয়ে দেখলাম আকাশে উজ্জ্বল সাদা তুলোটে মেঘ, সামনে মেঘনা, আর পায়ের নিচে বালু। অন্তত একশ' বিকেল কাটানোর সৌন্দর্য চারিদিকে নিয়ে একটি বিকেল কাটানোর জন্যে আমরা ভৈরবের পুলের দিকে এগিয়ে গেলাম, সুতরাং মনে করলাম পুলের সন্নিকটে বসে নিশ্চিন্তে সন্ধ্যেটা কাটবে ভাল।

ভৈরবের পুল আমাদের কাছে যান্ত্রিক। কিন্তু স্থানীয় পুরনো লোকদের কাছে ওটা ঐতিহাসিক। তারা ওটাকে অন্য চোখে দেখে। সুখ-দুঃখের সরু-মোটা দুটো তারে ওর পুরনো স্মৃতি তাদের মনে পাক দেয়। তারা বলাবলি করে: তোমার মনে নেই, সেই নৌকো দিয়ে নদী পারাপার করত।...একবার একটি মেয়ে পড়ে গিয়ে মারা যায়...অমুকের বাপে এক বছর লোক পার ক'রে বহু টাকা রোজগার করেছিল...আজ যে পুল নিমেষে

পার ক'রে নিয়ে যায়, তখন তিন ঘণ্টা লাগত এটা পার হতে···কত হট্টগোল, কত বেচাকেনা···।

ভৈরব পুলের একশ' হাত এ-পাশে উঁচু রেল লাইনের ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখার সময় যে সত্যটি আমার মনে উদ্‌ঘাটিত হ'ল, তাতে অবাক হয়ে গেলাম। একেবারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও যে সূর্যাস্ত দেখা যায়, অর্থাৎ কবির ভাবপ্রবণতার মাধ্যমে নয়, চিত্র সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে, তা' প্রথম বুঝলাম এই সূর্যাস্ত দেখে। আকাশের ক্যানভাসটা এত বড় এবং এর মধ্যে সূর্যাস্তের সময় যেখানে রঙের খেলা দেখা যায় সে জায়গাটা ঐ ক্যানভাসের তুলনায় এত ক্ষুদ্র ও এত একপ্রান্তে যে, যদি সত্যিকার ক্যানভাসে একপ্রান্তে অত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সূর্যাস্তের রঙগুলি দিয়ে কেউ ছবি আঁকত তা' হলে স্পেসিং-এ ছন্দপতন ঘটত। তাই যখন দেখলাম সিঁদুরে রঙ তামাটে হয়ে ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ আকাশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে, তখন বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য, এই আবিষ্ট পরিবেশের মধ্যেও যে চীনাবাদাম খাচ্ছিলাম তার স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে যেতে লাগলাম। তাই একটি পচা চীনাবাদামে কামড় দেওয়ায় পরিবেশের তাল কেটে গেল; এবং সে তাল পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে কিছুটা অগ্রসর হতে না হতে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, কারণ, দ্বিতীয়বার একটি পচা চীনাবাদামে কামড় পড়ল। আমি একেবারে দাঁড়িয়ে বললাম: "ঘরে ফেরা যাক।" সঙ্গের ওরা জিজ্ঞাসা করল: "কেন?" আমি কিছু বললাম না; কারণ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টির মতো কবির আবেশ আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, সুতরাং আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করলাম আমাদের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যতার মোকাবেলায় আত্মিক সূক্ষ্মতা বিজ্ঞানের উপর ভিত্তিমান করলে তা' কত ঠুনকো হয়ে দাঁড়ায়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া হবে মনে করেছিলাম, কিন্তু হ'ল খানা-পিনা। সুতরাং দেরি হ'ল শুতে। শুয়ে মনে হ'ল নতুন জায়গায় এসেছি। দিনে সাধারণতঃ এ প্রশ্ন মনে ওঠে না। এমন কি একই শহরে একস্থান হতে অন্যস্থানে গেলে রাতে শোবার পর মনে হবে নতুন জায়গায় এসেছি। কেন এমন হয় এ-নিয়ে অনেকে গবেষণা করেন। কিন্তু এর কারণ যে সামান্য তা' উপলব্ধি করেন না। নতুন—বিনামা থিওরীর দ্বারা এটা সহজে উপলব্ধি করা যায়। জুতোটা নতুন হলে চোখ বন্ধ ক'রেও আপনি বলতে

পারেন নতুন। কারণ, অভ্যস্ত পায়ে সামান্য ব্যতিক্রম হলেও আপনি ঠিক পান। বিছানা সম্বন্ধেও তাই। এমন কি যে বালিশটি আপনি ব্যবহার করেন, ঠিক সেটা না হলে আপনি ঘাড় রেখেই আরাম পাবেন না। সুতরাং বিছানা নতুন হলে পরিবেশ আপনার নতুন লাগতে বাধ্য।

পরের দিন ভৈরবের বাজারের দিন। বাজারের দিন বাড়ীওয়ালাদের সঙ্গে আপনি সহজে যেতে পারেন; কারণ, তাদেরও বাজারের দরকার হয়। সুতরাং আগ্রহ সহকারে আপনাকে নিয়ে যাবেন, কারণ আপনাকে রথ দেখানোর সঙ্গে তাঁদের কলা বেচা একত্রে চলতে থাকবে।

বাজারের কাছে এলে শুনলাম লাউড স্পীকারে বক্তৃতা। একশ' দশ দফার কীর্তি-কাহিনী। কাছে এসে বুঝলাম ব্যাপারটা। পেটের অসুখের ওষুধ হ'ল এটি। বক্তা প্রশ্ন করছে: আকবর ও আওরঙ্গজেব যে-রাজ্য স্থাপন ক'রে গিয়েছিলেন, তা' কেন গেল? সিপাই বিদ্রোহ কেন কৃতকার্য হ'ল না? ইংরেজরা কেন জয় করতে সক্ষম হ'ল? এবং তারা এতদিন টিকে গেল কেন?···প্রশ্ন করছে কিন্তু উত্তর চাচ্ছে না, কারণ, এ উত্তর তো ইতিহাস দিতে পারে না। সে উত্তর সঞ্চাত হয়ে আছে একটি ওষুধের বটিকার মধ্যে। তাই বক্তা একটি শিশি তুলে বললেন: "এ জবাব পাবেন এর মধ্যে। ভাইগণ, আকবর-আওরঙ্গজেবের পরবর্তী বাদশাহদের সামর্থ্য ছিল না। কেন ছিল না ভাইগণ? ছিল না—তার কারণ হজম-শক্তির অভাবে তাঁদের বাহুবল লোপ পেয়ে যায়। সে শক্তি ইংরেজদের ছিল, তা' ছিল এই জন্যে যে, তারা কোনদিন পেটের অসুখে ভোগেনি। শুনেছেন কোনদিন কোন ইংরেজ পেটের অসুখে ভুগেছে?" এই বলে জনতার কাছ থেকে উত্তরের আশায় একটু থামল। জনতা নিরুত্তর। বক্তা আবার বলল: "লজ্জা করবেন না, লজ্জা ক'রে ক'রে আমরা আমাদের অতীত গৌরবকে হারিয়েছি। দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলুন কোন ইংরেজকে পেটের অসুখে ভুগতে দেখেছেন কিনা?" একজন বলল: "না, দেহি নাই।" বক্তা বলল: "ভাই, আপনি এগিয়ে আসুন। দেখুন, এর কাছে প্রমাণ পাবেন যে, ইংরেজরা পেটের অসুখে ভোগে না। সুতরাং তারা শক্তিশালী জাতি।" তার পর যা বলা হ'ল তা' হ'ল: এই দেশ আপনাদের ডাকছে, দেশের সুসন্তান হোন। এই বটিকার এক শিশি ক'রে ঘরে নিয়ে যান, কারণ আপনার পেটের অসুখ থাকতে দেশ কোনদিন উন্নতির উচ্চ শিখরে

উঠতে পারবে না। দেখলাম ছাত্র ও নেতাদের মতো এরাও রাজনীতি সম্বল করেছে।

বাজার দেখে, কলেজ দেখতে গেলাম। প্রিন্সিপাল সাহেব ফিরে এসেছেন। মিন্নাত আলী দুপুরে খাওয়ার দাওয়াতটা তাঁর কানে দিয়ে এল।

তাই দুপুরের খাওয়াটা দেরিতে হ'ল। তিনি কি একটা কাজে আটকে গিয়েছিলেন। পরোক্ষভাবে সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে আবছাভাবে জানলাম যে, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফিস দাখিলের শেষ তারিখ থাকায় তিনি উঠতে পারছেন না। ক্ষুধাটা যখন একটু তাতিয়ে উঠল, তখন মিন্নাত আলীকে বললাম, এবার খাবার ব্যবস্থা একটু 'প্রত্যক্ষ' করো। সে চট ক'রে রিক্শায় উঠে গিয়ে পট ক'রে তাঁকে নিয়ে এল। পটটা চটে'র মতো অবশ্য এত তাড়াতাড়ি হয়নি। তাই খাওয়াটা এমন সময়ে হ'ল যখন খেয়ে ঘুমনো ছাড়া উপায় ছিল না। তাই ঘুমিয়ে উঠলাম সেই সন্ধ্যেয়। আলস্য ভাঙার জন্যে যে ঘুরে আসা তার ভেতরে ভৈরবকে শেষবারের মতো দেখলাম। তার পর যখন ট্রেন ছাড়ল, তখন ভৈরব আর আমার মনে স্টেশন নেই—রউফ ও মিন্নাত আলী আমার দুটি প্রিয় ছাত্রের বাড়ী ও একদিনের স্মৃতি সব মিলে ভৈরবকে আমার মনে নতুন রূপে প্রতিভাত করল।

নাম রসায়ন

ইংরেজীতে একটা কথা আছে: নামে কি আসে যায়। গোলাপকে যে নামই দাও, তা' গোলাপই থাকবে। কথাটাকে দর্শনের পর্যায়ে ফেললে হয় তো খাঁটি, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ফেললে তা' হয় খাটো। যদি সব গোলাপই গন্ধে ভরপুর হতো এবং দেখতে নিটোল সুন্দর হতো তো হয়তো কথাটা হতো সত্যি। কিন্তু এমনও গোলাপ আছে, যা দেখলে কিংবা শুঁকলে আমরা বলি, "এ আবার গোলাপ নাকি?" তাই আপনার চাকরকে যখন দোকান থেকে এক তোড়া গোলাপ আনতে বলেন, তখন মনে করেন যে, তার মধ্যে এমন গোলাপও থাকবে, যাকে সত্যিকার গোলাপ নাম দিতে আপনি নারাজ এবং চাকরও হাজারো কাজের ভেতর রূপ-রস-গন্ধ যাচাই ক'রে গোলাপ নাম সার্থক করা ফুল আনার দায়িত্ব থেকে বেঁচে যায় এই বলে, "এক তোড়া গোলাপ দাও হে।" যে-কোন ব্যাপারেই দেখবেন, এই জট পাকানো বিশ্বে নাম বিশেষ সাহায্য করে। ধরুন, আপনার স্ত্রী আপনাকে একটা শাড়ী আনতে বলছেন, বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে: "শাড়ীটা হবে, বুঝলে, ঐ যে সিল্কের মতো সুতোর অথচ বেশ শক্ত, রঙটা তোমার গিয়ে সবুজের ভেতর লালচে; সবুজ হয়তো কখনো দেখাবে, কখনো হয়তো লালচে, আবার কখনো হয়তো দুটো মিলে একটা জলজলা ও সাথে সাথে একটা মন্দা রঙের ভাব দেখাবে—বুঝলে তো? আর প্যাটার্নটা হ'স আঁচলের যে নক্সা, সামনে যে কুচিটা পড়বে তাতেও সেই নক্সা। কেমন, বুঝেছ?" আপনি কি বুঝলেন আপনিই জানেন, কিন্তু আপনার বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ ক'রে আবার যেন বুঝানোর চেষ্টা না হয়, তার জন্যে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন। আমরা ভাষায় এমন এগিয়ে গেছি যে, কথা বললেই আমাদের মনের ভাবটা সঠিকভাবে ধরা পড়ার ভয় থাকে; সেই জন্যে যখন আমরা মনে করি যে, আমরা যা বুঝেছি তা' পরিষ্কার বোঝাতে চাইনে, তখন একটা দু'ধারি মাথা নাড়ি। মাথা নেড়ে এড়াতে চাইলেও আমাদের মন নিষ্ক্রিয় থাকে না, ব্যাপারটা নিয়ে নানা রকম বিশ্লেষণ করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে আপনার মাথা নাড়ার সময় আপনার মন হয়তো বিশ্লেষণ করল এই ভাবে: দোকানে গিয়ে স্ত্রী যে

কথাগুলো বললেন, তা' বললে কোন না কোন দোকানী সঠিক একটা শাড়ী বের ক'রে দিতে পারবেই; নয়তো কোন শাড়ী দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, সেটা আপনার স্ত্রীর বর্ণনাক্রান্ত। কিন্তু আনার পর শাড়ীটা দেখে যখন আপনার স্ত্রী বললেন: "দুত্তোর, একি এনেছ, এই তোমার বুদ্ধি?" তখন বুঝলেন বর্ণনা থেকে একটা জিনিস বোঝা সোজা নয়। এই ব্যাপারটাই, যদি আপনার স্ত্রী তিনটে নাম ব্যবহার করতেন, দেখুন কত সোজা হতো: একটা সুতোর, একটা রঙের ও একটা শাড়ীর প্যাটার্নের। অর্থাৎ তিনি এইটুকু বললেই অভ্রান্ত হতো, টিসুর একখানি ধূপছায়া পাটলি এনো।

মানুষেরও ব্যাপারে নাম ব্যবহারটা বিশেষ জরুরী। দেখুন না কারও যদি নাম ভুলে যান, তো কি হয়? "অমুক হে, ওই যে হামিদ সাহেব, তার ভাইয়ের শালা।" "কোন্ হামিদ সাহেব, লোহাগড়া না সড়াইকান্দির?" "সড়াইকান্দির।" "কোন্ ভাই?" "মইজদ্দিন।" "তার কোন্ শালা"— এমনি ক'রে প্রশ্নোত্তর চলত, কিন্তু আপনার হঠাৎ মনে পড়ল: আবজু মিয়া। তাই বলতেই বলল "ও, আবজু মিয়া" বলো। ব্যক্তিকে এই স্বাতন্ত্র্য দেয় বলেই নাম। কয়েদীর কোন আলাদা ব্যক্তিত্ব নেই বলেই তার নম্বর। নাম স্বাতন্ত্র্য দেয় সত্যি, কিন্তু ব্যক্তিকে সব ক্ষেত্রে প্রকাশ করে না এবং করে না বলেই কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হতে পারে। তবে এ ঠিক, পদ্মলোচন নামকরণের সময় বোঝা যায়নি যে, সে দৃষ্টিহীন ছিল। কারণ, নামটা ব্যক্তিত্বের অতিশয়োক্তি হয় বটে, কিন্তু বিরোধী হয় না। ধরুন লেখকদের কথা, যাঁরা চরিত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাঁরা হবুচন্দ্র নামকে জ্ঞানসমৃদ্ধ নায়কের নাম হিসেবে গ্রহণ করবে না। বরঞ্চ তাদের মধ্যে অনেকে নায়কের ব্যক্তিত্ববাহী ক'রে নামকরণ করবে। সমাজে নামকরণ যখন হয়, তখন শিশু এত ছোট থাকে যে, নাম ব্যক্তিত্বের ছাপবাহী হতে পারে না; তাই 'সুবিনয়' কালে হয়তো একটা গোঁয়ারগোবিন্দ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নামের ব্যক্তিত্ববাহী হওয়ার অসুবিধে থাকলেও বিবৃতি-প্রধান হওয়ার অসুবিধে নেই। শুকুর ও বুধেকে দেখুন। শুক্রবারে হয়েছে বলে শুকুর নামকরণ লোকের হয়েছে, বুধবারে বলে বুধে। গ্রামে দেখুন, বড় যে মেয়ে সে বড়ু, ছোট যে মেয়ে সে ছুটু। ওরই আবার পাল্টা শহরে নাম বুড়ী ও খুকি। সব চাইতে উন্নত সংস্করণ হচ্ছে আবার তাঁদের নাম, যাঁরা বড় হয়ে নিজের

নামটা সংস্কার ক'রে বিবৃতি-প্রধান করেছেন। ধরুন মোহাম্মদ সোলেমান জব্বলপুরি অর্থাৎ তিনি জানাচ্ছেন, তিনি জব্বলপুরের। কিংবা আরও বিস্তারিত হয়ে তিনি হতে পারেন : ইবনে কাইয়ুম মোহাম্মদ সোলেমান জব্বলপুরি—অর্থাৎ কাইয়ুম সাহেবের ছেলেও তিনি।

বিবৃতি-প্রধানের বিকল্পে নাম তাছির-প্রধানও হতে পারে। তাছির-প্রধান মানে কতকগুলো নাম আসল একটা নামের আঁটির উপর গজিয়ে তাকে বড় ক'রে একটা totality of effect দেওয়ার চেষ্টা। অপরিস্ফুট একটা বিবরণ হয়তো ঘিরে থাকে নামটাকে, কিন্তু সেটা গৌণ। ধরুন, থমত্থুর ছেলে মামত্থু ইসহাক মিয়ার পেয়ারা চাকর ছিল। কাজেম মিয়ার দয়ায় যুদ্ধের বাজারে ব্যবসায়ে ঢুকে কালোবাজার ক'রে রাতারাতি লাখোপতি হয়েছেন। পোষাক-পরিচ্ছদ তো বটেই, বাড়ীঘর পর্যন্ত অতি আধুনিক স্টাইলে করেছেন। কিন্তু নাম হয়েছে ছুধে গো-চোনা। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে তিনি রক্ষা পেলেন এফিডেভিট ক'রে রাতারাতি নাম পরিবর্তন ক'রে। ইবনে খালেছুন আবছুল ইসহাক মোহাম্মদ কাজেমউদ্দিন মকবুল। অর্থাৎ থমত্থুর ছেলে ইছহাকের চাকরকে যুদ্ধের বাজারে কাজেমউদ্দিন কবুল ক'রে নেওয়ায় এই অবস্থা ; সুতরাং মামত্থু মোহাম্মদ হয়ে যে নামের আঁটি তৈরি করল, তাব উপর গজাল সংশ্লিষ্ট লোকদের নাম। হতে পারে, কৃতজ্ঞতা স্বীকারের একটা ইঙ্গিতও নিহিত রইল নামধারীর কাছে ; তবু এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল নামটাকে জাঁদরেল করা।

আবার দেখুন যাঁদের ছেলে হয়ে বাঁচে না তাঁরা ক্ষুদ্রতম এককড়ি, ছু'কড়ি, তিনকড়ি নাম রাখেন ; নামটা ক্ষুদ্র তো বটেই, সস্তাও ; সুতরাং নগণ্য, তাই যমের দৃষ্টি পড়বে না এই আকাঙ্ক্ষা। লণ্ডনেও হে-পেনী half penny আধলা—এ নাম পেয়েছি পুরনো লোকদের মধ্যে। হয়তো কুসংস্কার বশেই রাখা হয়েছে।

কেউ আবার রাখেন রাজা-বাদশার নাম, কেউ পীর পয়গম্বরের, কেউ বড় বড় নেতা ও কবি সাহিত্যিকের। নেতা ও রাজা যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের নাম রাখলে নাম বদলানোর সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে নেতা ও রাজা এখনও জীবিত, তাঁদের নাম নিয়ে ভরসা নেই।

শুনুন তবে। আমার এক আত্মীয়ার নাতির ডাকনাম ফারুখ রাখা হয়েছিল আদর ক'রে। ওদিন সেখানে গেছি, তিনি তাকে মিজু বলে

ডাকছেন। আমি তো অবাক। তিনি বললেন, ফারুকথের সিংহাসন গেছে, ও নামে আর কাজ নেই। ছেলেটির দু'বছরই হয়নি, তাকে এই মিজুত্ব থেকে কি ক'রে উদ্ধার করি এই চিন্তা। মিজু যদিও তার নিজের নামেরই চলন্তিকা, তবু বাদশার নামের কাছে ওটা খেলো। দু'দিন পর বৈকালিক এক আড্ডায় বন্ধুবান্ধবের সামনে কথাটা পাড়লাম। এক বন্ধু বলল, দেখ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। এক রাজার নাম যদি তুলতে হয়, তবে অন্য রাজার নাম দিয়ে তুলতে হবে। কথাটা খাঁটি, কিন্তু কোন্ রাজা? বন্ধু এবার 'দরশ' দিল, "যে রাজা সব সময়েই থাকবে এমনি একজনের। বিশ্বে পাঁচটি রাজা সব সময়ে থাকবে।" এই বলে বলল: "প্রথম হ'ল—ইংলণ্ডের রাজা constitutional monarcly—মার নেই। দ্বিতীয় হ'ল—।" এবার ঐতিহাসিক বন্ধু তার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়েই বলল: "দ্বিতীয় হ'ল বেলজিয়মের রাজা—শাসনতন্ত্রে declaration of right রয়েছে।" প্রথম বন্ধু একটুখানি কৃপার হাসি হেসে বলল: "সে ছেলেকে রাজত্ব ছেড়ে দেয় নি?" ডাক্তার বন্ধু ডেনমার্কে ছিলেন; অনেক আশা নিয়ে বললেন: "ডেনমার্কের রাজা, তাই না? বড় ভাল মানুষ, সাইকেলে চড়ে একদিন আমাদের হোস্টেলে এসে আমাদের দেখে গেছেন।" হেসে প্রথম বন্ধু বলল: "উনি হলেন তোমার গে নেতা টাইপ, নেতার যেভাবে পতন আসে, ওঁরও অমনি পতন আসতে পারে।" বলে বলল: "এ চারজন রাজা নিশ্চিত থাকবে ঠিক ইংলণ্ডের রাজার মতো; এমন কি রাশিয়াও তাদের মেনে নিচ্ছে।" এবার চরম অবস্থা; অস্থির হয়ে আমি বললাম: "আর ভুলিয়ো না, শীগগির বলো।" সে অম্লান বদনে বলল: "হরতন, ইসকাবন, চিড়িতন ও রুইতনের রাজারা।" আমরা সকলে হেসে উঠলাম। সে বলল: "এতে হাসার কি আছে?" আমরা বললাম: "এ নাম দেবে ছেলেপেলেদের?" সে বলল: "কেন নয়? রাজা-বাদশার নাম দিলে যদি হাস্যকর না হয় তো এতে হবে কেন? যে বাপ-মা মনে করতে পারেন না যে, ছেলের নিজের নামই তাকে বিখ্যাত করবে, কিংবা যেটুকু খ্যাতি সে লাভ করতে পারে তা' নিজের নামেই করুক, সে বাপ মা কি সন্তানকে কম হাসির পাত্র মনে করে? নামে সত্যিকার ভাল মন্দ বলে কিছু নেই, any name is good, if you can make it famous enough. পৃথিবীর বিখ্যাত কোন্ নাম তোমাদের খারাপ লাগে? তবে?

নামটা ব্যক্তিদের আলাদা ক'রে জট ছাড়ানোর জন্য, জট পাকানোর জন্য নয়।"

কথাটা বাস্তবিক সত্যি। false impersonation-এর যে সব ব্যাপার তা' তো বেশীর ভাগই ঐ নাম এক বলে করার সুবিধে হয়। ক' গাঁয়ের কলিমদ্দিন খ' গাঁয়ের কলিমদ্দিনের নামে ভোট দিয়ে এসে দু'মাস জেল খাটতে পারে। হোস্টেলের এক নম্বর আবদুল মান্নান দু'নম্বর আবদুল মান্নানের মনিঅর্ডার সই ক'রে নিয়ে শুধু নিজেকেই বিব্রত নয়, সনাক্তকারী সুপারিনটেণ্ডেণ্টকেও ফাঁসাতে পারে। দুটো নাম এক হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। উপরোক্ত ব্যাপারে দেখুন, সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে দেখতে হবে: কোত্থেকে এসেছে টাকাটা? কে পাঠিয়েছে? কি বাবদ পাঠিয়েছে, এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর পেলে তবেই না ঠিক আবদুল মান্নানকে ধরা যাবে। সুতরাং দুটো নাম এক হওয়া মানে, পরিস্থিতি অনুসারে আইনের সমন্বয় সাধনের জন্যে বিশেষ দায়িত্ব আরোপিত হওয়া। এবং এমনি বিশেষ দায়িত্ব যেখানে, সেখানে আমরা সাবধানে চলি, কারণ তা' না হলে আইনের নির্দেশের ব্যতিক্রম হবে। কিন্তু সামাজিক পর্যায়ে আমরা এমনি পাল্টা-পাল্টি নাম দায়িত্বহীনভাবে ব্যবহার করি। একটা উপমা দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাত দুটোর সময় গাড়ী ক'রে তাঁরই একই নামের একজনের জামাই মায় কন্যাসহ রাত দুটোর সময় এসে উপস্থিত। পৌছেই কাউকে ডাকার আগে গাড়ী বিদেয় ক'রে দেয়। তার পর ডেকে সবাইকে তোলার পর জানতে পারে যে, গৃহকর্তার নাম ও শ্বশুরের নাম এক তো বটেই, তাদের চাকুরিও এক পর্যায়ের, তাই এই বিভ্রাট। গৃহকর্তা তখন তার নিজের মোটরে তাদের গন্তব্যস্থানে পৌছে দেন। ওদিন এক ডাক্তার বন্ধু বলছিলেন যে, তার নামের সঙ্গে অন্য একজনের নাম এক হওয়ায়, অনেক রোগী তার মিতার কাছে যাচ্ছে। এই সব সামাজিক ব্যাপারে বিপর্যয় হয় বটে, কিন্তু বে-আইনী কিছু ঘটে না বলে আমরা কম-বেশী নির্বিকার। কিন্তু এটাই যদি আইনের আওতায় পড়ত তো কি হতো? মুর্শিদাবাদের বহরমপুর যেতে ভুল ক'রে যদি আপনি উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার বহরমপুরে গিয়ে পৌছতেন তো আপনাকে পেনালটিসহ অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হতো, উপরন্তু ফিরে আসার কড়িও গুণতে হতো।

নাম দৃষ্টে যে নাম রাখা হয় আদি নামটার সঙ্গে এক হলেও সেটা বিপর্যয় আনতে পারে না। আজকের শিশু যার নাম কোন নেতার নামে রাখা হ'ল, সে আগামীতে নেতা হলেও আদি নেতার সঙ্গে তাকে ভুল করার মৌকা থাকে কম। কারণ, বয়সের প্রভেদে চিন্তাধারার ও কার্য-কলাপের প্রভেদ খুব বেশী থাকে। দু'জন Pitt, দু'জন নেহরুকে দেখুন। এমন কি বাপ-ছেলে হয়েও চিন্তাধারার বিভিন্নতায় তারা সম্পূর্ণ আলাদা। তেমনি লেখকের বেলায়ও এ কথাটি খাটে।

সুতরাং বিপর্যয় তাদের থেকে আসে না, আসে সমসাময়িক নাম থেকে। অর্থাৎ যে নাম খ্যাতনামা কোন নাম দৃষ্টে রাখা হয় নি, কিন্তু খ্যাতনামা নামের সঙ্গে এক হওয়ায় বেরিয়ে পড়েছে। এই বিপর্যয় বেশীর ভাগই ঘটে লেখকদের বেলায়। নেতাদের বেলায় ঘটে না বললেই হয়। কেন এ রকম হয় দেখুন। নেতার ব্যক্তিত্ব তার চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে। তার খ্যাতি তার কথাগুলোকে মূল্য দেয়। অর্থাৎ তিনি যদি নেতা না হতেন তো কথাগুলোই শুধু তাকে কোন খ্যাতি দিত না। তাই নেতা বলতেই সুরতহালযুক্ত বিশেষ ব্যক্তিকে আমরা মানসচক্ষে দেখি। সুতরাং ব্যক্তি হিসেবে তিনি এমনই জবরদস্ত হয়ে ওঠেন যে, অন্যের সঙ্গে তাকে ভুল করার অবকাশ থাকে না। লেখকের বেলায় এর উল্টো। লেখক নাম করেন তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যে নয়—তাঁর বক্তব্যের জন্যে। সুতরাং একই নামের কেউ যদি একই ধাঁচের লেখার চেষ্টা করেন তো আদি লেখকের ও তাঁর পাঠকদের মনে একটা বিপর্যয় আনতে পারেন। আদি লেখকের লেখা পড়ে বলতে পারে পাঠক : "অমুক বইখানা ভদ্রলোক ভাল লেখেন নি। ভদ্রলোকের মধ্যে মধ্যে কি হয় যেন!" আবার লেখক মনে করেন, এই আর একখানা বেরুল, আমাকে আবার ডোবাবে, জবাবদিহি করতে হবে মধ্যে মধ্যে লেখায় এত ব্যত্যয় হয় কেন? এই আত্মিক যমজের বোঝা আর কত টানব?

মজার কথা এই বিপর্যয়ের প্রতিষেধক নেই। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ব্যাপারটা দেখুন। হঠাৎ দেখা গেল ঐ নামে আর একজন গল্প লিখছেন; তিনি যদি কবিতা লিখতেন অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য যদি ভিন্ন হতো তো অসুবিধে হতো না, লোকে ধরেই নিত যে তিনি অন্য ব্যক্তি। তা' না হওয়ায় বেচারা শ্রীতারাশঙ্করকে বলতে হ'ল শ্রীতারাশঙ্কর বলে অন্য এক

ব্যক্তিও গল্প লিখছেন। এর পর তাঁর নিজেকে সেই ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তিনি নিজ নামে আব 'শ্রী' যোগ করবেন না। 'শ্রী'-হীন তারাশঙ্কর হয়েই তিনি থাকবেন, অন্য তারাশঙ্কর শ্রীমান হয়েই বিরাজ করুন। কিন্তু এই 'শ্রী' হীনতা তাঁকে কি নিস্তার দিতে পারে? অন্য তারাশঙ্করও যদি 'শ্রী' ত্যাগ করেন তা' হলে? তা' হলে কিছুই হবে না। কারণ, ব্যাপারটা এখনো সামাজিক পর্যায়ে; শ্রী যোগ করা, না করা নিজের ইচ্ছায়; সুতরাং আইনের প্যাঁচে পড়ে না। নইলে শ্রীর ব্যাপারটা সোজা হতো না। ঘৃত নিয়ে যার কারবার, সে কি শ্রীঘৃত বলে তার ঘৃতকে চালাতে পারে? মোটেই না। আইনে এসে ধরবে, তার খেসারত দিতে হবে। মানুষের শ্রীর চাইতে ঘৃতের শ্রী বেশী, একথা যতই বিশ্রী হোক, এ হতে পারে এই জন্যেই যে, ঘৃতের শ্রীটা আইন দ্বারা রক্ষিত।

যে পরিস্থিতি এ ব্যাপারে কলম ধরাল, এবার সেটাই আলোচনা করব। কিছু দিন আগে আমার এক বন্ধু, তিনি আবাব আমার লেখার গুণগ্রাহীও, এসেই বললেন: "অমুক কাগজে আজ দেখলাম তোমার নামে এক ভদ্রলোক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।" আমি একটু চুপ থেকে বললাম: "আমি নই তা' কি ক'রে বুঝলে?" সে বলল: "বা বে দেয়ালের ওপাশ থেকে নুরুল মোমেন নামে কেউ কথা বললে তাকে তুমি বলে ভুল করব? তোমার লেখায় তুমি ওতপ্রোত, ভুল কি ক'রে হবে? তা' ছাড়া লেখাটা অর্ধেক পড়ে ছেড়ে দিলাম যে!"

অবশ্য ভাল লিখি কিনা সে প্রশ্ন তুলব না, কিন্তু অর্ধেক পড়ে ছেড়ে দেওয়ার মতো যে লিখি না তা' জানি। জিজ্ঞাসা করলাম: "অর্ধেক পড়ে ছেড়ে দিলে যে, লেখাটা পছন্দ হ'ল না তোমার?" বলল: "লেখাটা মন্দ নয়, অন্যের নামে লেখাটা হলে বেশ ভালই লাগত; কিন্তু তোমার লেখা হলেই তোমাকে চাই, অর্থাৎ ইয়ে—ইয়ে।" আমি কেটে বললাম: "ওটা আমিই লিখেছি।" সে বলল: "তা' হলে এবার থেকে লেখা ছেড়ে দাও।" এই বলে সে বেরিয়ে গেল। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। এ আবার কোন্ নুরুল মোমেন এল সাহিত্যক্ষেত্রে? আমাকে এখন এমন সব প্রশ্ন করা হবে যার উত্তর দিতে পারেন কেবল সেই ভদ্রলোক; তাকে জবাবদিহি হয়তো করতে হবে সেই সব ব্যাপারে যার জন্যে আমি দায়ী। আজকার দিনে একই নাম কী না বিপর্যয় আনতে পারে সংসারে? আমি এক মতাবলম্বী—লিখলাম আমার কথা; তিনি আবার অন্যপন্থী,

তার রায় দিলেন লোকে বলল নুরুল মোমেনের মতের ঠিক নেই। তিনিও চটলেন, আমিও চটলাম।

অথচ এই নুরুল মোমেন নাম খুবই বিরল বলে মনে করেছি; তিনিও করেছেন নিশ্চয়ই। ধ্বনাত্মিক ঐশ্বর্য আছে বলে নামটাকে ভালও বেসেছি ছোট কাল থেকে। শেষ কালে এই নাম দু'জনের। লেখার বাহক হয়ে এমনিভাবে পর্যুদস্ত করবে তা' মনে করিনি। অবশ্য আমার নামটা জীবনে একবার মাত্র আমাকে অপদস্থ করেছে। আমার বাড়ী যাওয়ার কথা; আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম। বাড়ীতে বড়ভাই টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন "Momen started arrange conveyance at station." বাড়ীর স্টেশনে পৌঁছে দেখি, হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার পাঁচ ছ'খানা পাল্কী, অজস্র লোকজন এসেছে। গাড়ী থামতেই আমাদের কর্মচারী এসে বললেন: "ও, আপনিও এসেছেন স্যার? তাড়াতাড়ি নামুন আর বিবি সাহেবাদের নামানোর বন্দোবস্ত করুন।" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "বিবি সাহেবাদের? তিনি বললেন: "হ্যাঁ স্যার, পরিষ্কার লেখা আছে, বরঞ্চ আপনি যে আসবেন তা' লেখা নেই।" আমি দেখলাম টেলিগ্রামটা। পরিষ্কার লেখা: Women started arrange conveyance at station." m উল্টে w হয়েছে, তাই momen হয়েছে women, ভয়ানক বিব্রত হলাম। বললাম: "হ্যাঁ, শেষ মুহূর্তে তাদের আসায় বাধা পড়েছে, তাই আমিই এলাম।" আমার কাছেও পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু ছ'খানা পাল্কীর জন্য পঁচিশ টাকা গুণে দিয়ে মতটা পাল্টে ফেললাম। এই একবার মাত্রই নামটা অপ্রস্তুত করেছিল। কিন্তু এখন তো কিছুই ঠিক নেই। বছরে, মাসে এমন কি সপ্তাহেও একবার ক'রে এমনি বিপর্যয় ঘটতে পারে। যাঁরা আমার লেখা পড়েছেন, তাঁরা ধরতে পারবেন কোন্‌টি আমার কোন্‌টি আমার নয়। ভাল বলে নয়, আমার বলার ধরন স্রেফ আমার মতো বলে। কিন্তু যারা আমার লেখা পড়েন নি, অন্যের কাছে শুনেছেন, তাদের নিয়েই মুশকিল। তাঁদেরকে বলি তাঁরা যেন নুরুল মোমেন-এর লেখা পেলে পড়েন। তা' হলে বাজারে একই নামের দুটো দ্রব্যের ব্যবহারের মতো একজনের লেখার অনুরক্ত হয়ে পড়বেন, তখন অন্যকে চিনতে দেরি হবে না। মোদ্দা কথা হচ্ছে দুটো নুরুল মোমেন আছে এই কথাটা জানিয়ে দিলাম এবং এ কথাটা জানলে আপনারা সহজেই বেছে নিতে পারবেন কে কোন্‌টি।

ঠোঙা-সাহিত্য

ঠোঙা-সাহিত্য বলতে কি বোঝায়?

এই প্রশ্নটি এমনভাবে করা হয়নি, যেমন নাকি ব্যাখ্যা করার আগে লোকে প্রশ্ন তুলে সেটাকে ব্যাখ্যা করে। ঠোঙা-সাহিত্য কিছু দিন থেকে আমার অনুসন্ধিৎসাকে যেভাবে কণ্ডুয়ন ও জ্ঞানকে যে হালকাভাবে বর্ধিত করেছে তাতে এ বিষয়ে কিছু লেখার জন্যে আমার মন অত্যন্ত ঝুঁকে পড়েছিল। হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল দেখতে, ঠোঙা-সাহিত্য বলতে সাহিত্যের সমালোচকরা কি বোঝেন বা আশা করেন। তাই তাদের দু'চারজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ প্রশ্নটা: ঠোঙা-সাহিত্য বলতে কি বোঝায়?

জিজ্ঞাসা করলাম এমনভাবে যেন এ কথাটা আমি সাহিত্যে আধুনিক পেয়েছি এবং তার সঠিক মানে বুঝতে পারি নি। যতই আজগবি হোক না কেন, তাদের কাছ থেকে আমি উত্তর একটা পাবই আশা করেছিলাম। কারণ না বোঝাটা সমালোচকের ধাতে লেখা নেই। উত্তর আশা করলেও, শুনে অবাকই হলাম। বুঝলাম যার বুদ্ধি ক্ষুরধার তার কাছে দুর্বোধ বলে কিছু থাকতে পারে না। ভুলটাও তিনি এত কঠিনভাবে ঠিক বুঝবেন যে, সেটার হতেই হবে শুদ্ধ; অর্থাৎ তিনি সেটা ভুল বুঝেই এমন চমৎকার বুদ্ধিপ্রসূত ব্যাখ্যা করবেন যে, আদি মানেটা সে ব্যাখ্যার কাছে টিকবে না। আপনাদের মধ্যে যাঁরা লেখক, তাঁরা, ধরুন, একটা কিছু লিখছেন; হঠাৎ দেখা হ'ল সূক্ষ্ম-বুদ্ধি নামকরা কোন সমালোচকের সঙ্গে। তিনি আপনাকে বললেন, "আপনার লেখার এটুকু চমৎকার হয়েছে।" বলে একটু ব্যাখ্যা করলেন, করে বললেন, "এ কথাটা টুর্গেনিভও বলেছিলেন।" বলে তার উদ্ধৃতিও দিলেন। তিনি যখন ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন আপনার মনে হচ্ছিল আপনি যা মনে ক'রে লিখেছেন উনি তার উল্টো বুঝছেন, যদিও এও মনে হচ্ছিল তাঁর বোঝাটা আপনার বোঝাকে অতিক্রম করলেও তাছির করছে বেশ। তার পর টুর্গেনিভের উদ্ধৃতিটা যখন দিলেন, তখন আপনি অবাক হলেন দুটোর মিল দেখে। সমালোচকের কথার পরিপ্রেক্ষিতে টুর্গেনিভের কথাটা মনের মধ্যে উল্টেপাল্টে যতই দেখতে লাগলেন ততই

মনে করলেন আপনার লেখার ভুল মানেটাই বড়। তার পর একটা জিনিস মাত্র বাকী থাকবে আপনার সেই ভুল মানেটা গ্রহণ করার জন্যে। সেটা হবে যখন প্রথম সাক্ষাতেই কোন বন্ধুর কাছে আপনার লেখার টুর্গেনিভের বাক্যবাহী মানেটা ক'রে দেবেন তখন।

আপনার এতে হতাশ হবার কথা নয়, বরঞ্চ আশান্বিত হবেন, আপনার চিন্তা আপনার নিজের মানে করার স্তর পেরিয়ে অন্যের ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হয়েছে। সমালোচকরা সক্রেটিস, সেকস্‌পিয়রকে পর্যন্ত উল্টো বুঝে বড় ক'রে তুলছে, আপনি তো কোন্ ছার।

'ঠোঙা-সাহিত্য' সম্বন্ধে তাই সকল ব্যাখ্যা মন দিয়েই শুনলাম। কিন্তু শুনলামই শুধু। কারণ এর কোন ব্যাখ্যাই আমার আদি যে ধারণা তা' থেকে আমাকে বিচ্যুত করতে পারল না।

পারল না কেন? অন্য ক্ষেত্রে হলে বলতাম আমার লেখা আমি যেটা বুঝি সেটাই আমার কাছে মোক্ষম। অন্যে ঠিক না বুঝলে ধরি ঠিক বোঝে নাই, বলি ভুল বুঝেছে; আবার ব্যক্তি বিশেষে ভুল বুঝলে বলি ঠিক বুঝেছে। যদি কেউ বলে আমার লেখাটা অমুক বড় লেখকের মতো হয়েছে, তা' হলে মনে করি আমার লেখাটাই মাঠে মারা গেল।

এ ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা প্রযোজ্য নয়; কারণ এটাতে অতটা তফাত ক'রে বোঝার অবকাশ নেই। বিষয়টি আমার বেতের ছড়িটির মতো স্পষ্ট ও সোজা। এবং ছড়ির ব্যাপারে যতটুকু তারতম্য হতে পারে, এর ব্যাপারেও বড়জোর সেইটুকু মাত্র হতে দিতে পারি। অর্থাৎ ছড়িটা তুলে ধরে যদি জিজ্ঞাসা করি, "এটা কি?" উত্তর আশা করব: 'ছড়ি'। কিন্তু কেউ যদি বলে 'গজ', তা' হলে বলব, "ওহ্ দ্য আইডিয়া!" মেপে দেখব, এবং একগজ হলে সমালোচনার এ-সম্প্রসারিত দিকটাও গ্রহণ করব।

সুতরাং ছড়ির গজত্বের মতো ঠোঙা-সাহিত্য একমাত্র আমার এক বন্ধু সাহিত্যিকের ব্যাখ্যা ব্যতিক্রম হলেও বিচারসহ বলে আমার মনে হ'ল। তাই সেটা আপনাদের উপহার দিয়ে আসলে ঠোঙা-সাহিত্য যে কি তা' বলব।

সাহিত্যিক বন্ধুর ব্যাখ্যাটা সেই স্কুলের ছেলের 'song' মানে 'আমি দেখিয়াছিলাম' করার মতো অনুশীলিত মনে হ'ল। song মানে "গান"। 'gun' মানে 'কামান'। 'come on' মানে 'আইস'। 'I saw' মানে

'আমি দেখিয়াছিলাম'। তিনি বললেন : ঠোঙা যে-ইঙ্গিত মনে আনে ইংরেজী 'পকেট' শব্দটাও তাই আনে। একজনকে আওতায় আনলে বলা হয় পকেটস্থ করা হ'ল। তা' হলে ঠোঙা আওতায় আনার ইঙ্গিত দেয়। আওতা হ'ল coterie, coterie হ'ল গোষ্ঠী। সুতরাং এক আওতায় যে সাহিত্য গড়েছে টোঙা-সাহিত্য বললে বোঝা যায় সেই সাহিত্য, তা' হলে এটা হ'ল সম্পূর্ণ গোষ্ঠী-সাহিত্য। নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের দুর্নাম ক'রে নস্যাৎ করাই হ'ল এর প্রধান ধর্ম। এবং সেইজন্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর যখন মিল হয়ে একটা সর্ব-দলীয় সম্মেলন-টম্মেলন হয়, তখন তাদের মিলটার ঠোঙা-সর্বস্বতাই প্রধান হয়ে চোখ পড়ে। অর্থাৎ চাল, ডাল, সুপারি, লবণ ইত্যাদি বাজার ক'রে আনার সময় বিভিন্ন ঠোঙায় আনলে, এবং ঠোঙাগুলো ফেঁসে গিয়ে জিনিসগুলো একত্র মিলিত হলে যে রকম হয়, সম্মেলনের মিলও হয় ঠিক সেই পর্যায়ের। দোস্ত আমার চোস্ত কথাই বলেছেন, কিন্তু এটা তো সঠিক সাহিত্য নয়, সাহিত্যের রাজনৈতিক গবেষণা।

ঠোঙা-সাহিত্য হ'ল সত্যিকার সাহিত্য: অনুসন্ধিৎসা জাগানিয়া পাঠ্যবস্তু, ও ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি—সাহিত্যের মতো এসব ঠিকই আছে; কিন্তু তফাত হ'ল এই, ঠোঙা-সাহিত্য হতে জ্ঞান আপনি আপনার দরকার অনুসারে আহরণ করতে পারবেন না; জ্ঞান আপনাকে হঠাৎ ধরা দেবে, সুতরাং তার জন্য আপনার নির্ভর করতে হবে আপনার ভাগ্যের উপর।

উদাহরণ দিচ্ছি।

আপনারা অনেকেই জানেন, পঞ্চতন্ত্র বলে সংস্কৃতে উপদেশের একখানি গ্রন্থ আছে। এবং শুধু এইটুকুই হয়তো জানেন। কিন্তু কিভাবে সে গ্রন্থখানি লেখা হ'ল তা জানেন না। লেখার ইতিবৃত্ত বেশ চমকপ্রদ। দাক্ষিণাত্যে অমরশক্তি নামে একরাজা ছিলেন, তাঁর ছিল গুটিকয়েক মূর্খ পুত্র। তাদের সৎশিক্ষা দিতে রাজা বদ্ধপরিকর। কিন্তু তারা যে মূর্খ, কঠিন কিছু আয়ত্ত করতে পারবে না, সুমতি নামক জনৈক মন্ত্রী সেটা বুঝলেন। এবং রাজপুত্রদের সম্মান রেখে কায়দা ক'রে বললেন: "রাজন, জীবন ব্যাপার অনিত্য, কিন্তু শব্দশাস্ত্রের জ্ঞান বহুকাল সাধ্য। অতএব, ইহাদের জ্ঞান বিকাশের সংক্ষেপ মাত্র কোন শাস্ত্রের কথা ভাবুন।" অর্থাৎ এর মধ্যেই তিনি পরিষ্কার ক'রে বলতে চাইলেন: "এই মূর্খদের অধিক কিছুর ভিতর

না নিয়ে গিয়ে অন্নের মধ্যেই রাখুন ; তা' হলে আখেরে কিছু বিত্থালাভ হতেও পারে।" সুমতি হয়তো ইশারায় বলে থাকবেন যে, গাধাকে পিটিয়ে মানুষ করতে পারে একমাত্র বিষ্ণুশর্মা। (জানি না, যেহেতু এখানে কতগুলি পৃষ্ঠা নেই, তবে মনে হয় তাই বলেছিলেন) কারণ কয়েক পৃষ্ঠা পরই আছে, রাজা বিষ্ণুশর্মাকে ডেকে বললেন : "মহাশয়, আমার প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া যাহাতে ইহাদিগকে অবিলম্বে .অর্থশাস্ত্রে অনন্তসাধারণ করিয়া তুলিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে আমি একশত ভূমি দান করিব।" তখন বিষ্ণুশর্মা রাজাকে বললেন : "মহারাজ, সত্য কথা বলিতেছি শুনুন, আমি একশত দানপত্রের বিনিময়েও বিত্থা বিক্রয় করি না। কিন্তু আপনার পুত্রদিগকে যদি ছয়মাসের মধ্যে নীতিশাস্ত্রবিদ্ করিয়া না তুলিতে পারি তবে নিজ নাম ত্যাগ করিব।" একথা শুনে রাজা খুশী হয়ে তাঁর পুত্রদের বিষ্ণুশর্মার হাতে তুলে দিলেন। ছয়মাসে তাদেরকে পণ্ডিত করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র লিখিত। এতে পাঁচটি ভাগ আছে। (১) মিত্রপ্রাপ্তি (২) মিত্রবেদ, (৩) কাকেকূলীয়, (৪) লব্ধ-প্রণাশ, (৫) অপরীক্ষিত কারক। তিনি কিভাবে এই পাঁচটি ভাগকে ছয়মাসে পড়ালেন, এবং পড়িয়ে আদপে কোন জুত করতে পেরেছিলেন কি না, কিংবা ছয়মাসে আমাদের বর্তমান মাষ্টারদের মতো কোনমতে সিলেবাস শেষ ক'রে দিয়ে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলতে পারব না। কারণ আগেই বলেছি, যে জ্ঞানটুকু আমার ভাগ্যে ধরা পড়েছিল তার মধ্যে ওগুলোর উত্তর পাইনি। কারণ এই যতটুকু বললাম তা ঠোঙা-সাহিত্য হতে, এবং সেখানে জ্ঞানলাভ কি রকম হঠাৎ ও অদ্ভুতভাবে হয় দেখুন।

মুসুরির ডাল ঢেলে রেখে, আমার স্ত্রী কাগজের ঠোঙাটি আমার মেয়ের হাতে দিলেন। সে ওটা ফুটিয়ে দিতেই নিচে দেখি একটা বইয়ের মতো জিনিস বেরিয়ে পড়ল। এই দিয়েই ঠোঙার তলাটা তৈরি হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর কয়েকটি ছেঁড়াপাতা জুড়ে ভাঁজ ক'রে, ঠোঙার তলাটায় দেওয়া হয়েছিল। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে 'পঞ্চতন্ত্রে'র সঠিক ব্যাপারটা জানি, কিন্তু আলস্যই বলুন আর যাই বলুন, জানা আর হয়ে ওঠেনি। আজ এমনি সহজভাবে ঠোঙায় ভর ক'রে জ্ঞানটা আমার দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে। এসেছে বটে, কিন্তু জমাট হয়ে আসেনি ; মধ্যে মধ্যে পৃষ্ঠা নেই, তাই কষ্ট করে যতটুকু দিয়েছি সেটা উদ্ধার করতে হয়েছে ; জ্ঞানের সঙ্গে মিশেছে রিসার্চের আনন্দ।

আপনার বাড়ীতে যে-সব ঠোঙা আসে সেগুলো একবার পড়ে দেখবেন, শুধু আনন্দই যে পাবেন তাই নয়, মনে হবে সমাজের নানা দিকটা উদ্‌ঘাটন ক'রে দিচ্ছে এই ঠোঙা-সাহিত্য।

সাহিত্য সৃষ্টিতে একটা নিছক মান নিশ্চয়ই আছে, সেই মানে উন্নীত না হলে সাহিত্যকে রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলে ধরা যায় না। কিন্তু অনেক সময় পরিবেশ নিম্নের মান-যুক্ত সাহিত্যকেও রসোত্তীর্ণ করে। ধরুন, একটি দুর্ভিক্ষ-সংক্রান্ত গল্প এখন যাকে খুব দাম দেওয়া যাবে না, সেটা হয়তো দুর্ভিক্ষের সময় বিশিষ্ট রূপে আবেদন ক'রে নিতান্ত উচ্চশ্রেণীর মনে হয়েছিল আপনার কাছে।

ঠোঙার উপর লেখা যে মানসিক পরিবেশে আপনি পড়েন, তাতে যা কিছু আপনি লেখা দেখেন, সেটাই আপনাকে খুশী করবে। কি না-দেখতে পাবেন আপনি সেখানে? অঙ্কের খাতার পাতা, ইতিহাসের পরীক্ষার খাতার পাতা, আদালতের পুরনো ডিক্রীর নকল, নানা জাতীয় বইয়ের পাতা, সিনেমার বিল, এমনি হাজারো জিনিস।

খোশ-খেয়ালে আপনি পড়ুন, বেশ লাগবে। 'দেখি কত নম্বর পেয়েছে?'—ইতিহাসের পরীক্ষার পাতাটি দেখে বললেন। দেখলেন লেখা "আট।" উত্তরটি তো মন্দ লেখেনি। কত'র মধ্যে আট পেল? আপনার মন বলল, 'বোধ হয় ষোলর মধ্যে।' হঠাৎ মনে হ'ল, 'আরে প্রশ্নটা কি?' মোটামুটি বোঝা যায় হয়তো কি প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু নম্বর যেখানে যাচাই করছেন সেখানে, আসল প্রশ্নটা চাই-ই। প্রশ্ন খুঁজতে গিয়ে হতাশ হলেন। তা' হবেনই। কোন ছাত্রই প্রশ্ন লেখে না; লেখে Ans. to Q 2 কিংবা স্রেফ Ans. 2। অনেকক্ষণ জল্পনা করেছেন—কি হতে পারে প্রশ্নটা? হঠাৎ দেখলেন নিচে একতাড়া চিঠি ভাঁজ ক'রে ঠোঙার বুনিয়াদ গড়েছে। খুললেন। বেশ রসালো চিঠিগুলো। নাম দেখলেন, চেনা নাম। কিন্তু কোথাকার? এই তো নম্বর ও গলি দুটোই লেখা আছে, কিন্তু শহর? সেটা কোন্ ঠোঙায় গেছে কে জানে, ও নামের গলি ঢাকায় ও চিটাগঙে দু' জায়গাতেই আছে। যাক পড়লেন চিঠিগুলো। লজ্জার তো বালাই নাই, কারণ ভদ্রতার বিরুদ্ধে তো যাচ্ছে না। এখন ওটা পাবলিক প্রপারটি। যে-কোন বিখ্যাত লোকের মিউজিয়মের আয়নার বাক্সের ভেতর রক্ষিত চিঠি আপনি সপ্রতিভভাবে পড়তে পারেন, যা নাকি আপনি ঐ

ভদ্রলোকের ঐ চিঠিটায় লেখার সময় পারতেন না। ঠোঙার চিঠিগুলোও তেমনি।

পত্রিকায় ছাপানো গল্প ভাল না হলে আপনি পড়তে পারেন না। কিন্তু এমন সব নামঞ্জুর গল্প যা পত্রিকাওয়ালারা গাদা মেরে সের হিসেবে বিক্রি ক'রে দিয়েছেন ও ঠোঙার বুকে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, যদি একবার চোখে পড়ে তো আপনি যে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন তা' পড়তে তাই শুধু নয়, যেটুকু পেলেন না তার জন্যে খুব আফসোসও হবে।

মধ্যে মধ্যে চমৎকার ছিটে-ফোঁটা পাওয়া যায় ঠোঙা-সাহিত্যে, যা কাজে লাগানো যেতে পারে চমৎকারভাবে। At the Altar of the Law—আমার লেখা ইংরেজী নাটক যেটা ইংরেজ দর্শকের কাছেও খুব আদৃত হয়েছিল, সেটায় একটি কৌতুকময় কথা পরিবেশন করেছিলাম এবং তা' অনুশীলন ক'রে এনেছিলাম ঠোঙা-সাহিত্যের একটি গল্প থেকে। বশীর মোক্তারের মুখে হাসির কথা দেওয়া চাই, সফর আলী উকিলের সঙ্গে সে কথা বলছে। কিন্তু কি দেব? ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছি। বাজার এল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল: "বাবা, ঠোঙা পড়বে? খুব বড় ও খুব ছোট, দুটো ঠোঙা বাজার থেকে এসেছে।" কিছুদিন থেকে ঠোঙা-সাহিত্যের খুব চর্চা হচ্ছিল আমার বাসায়। হয়তো লিখছি, মোক্ষম সময়; এমন সঙ্কট অবস্থায় ছেলে দৌড়ে নিয়ে এল এক ঠোঙা। বলল: "দেখ, এ যদি কিছু মাত্র অঙ্ক জানে! তিন আর চার যোগ ক'রে আট লিখেছে!" যাক, বাজার থেকে আসা দুটো ঠোঙাই সে নিয়ে এল। এলাচির ঠোঙাটির উপর একটি ছোট গল্প পড়ে হঠাৎ মনে হ'ল, তাইতো এটাকে অনুশীলন ক'রে আমার নাটকে চালিয়ে দিলেই তো হয়। নাটকে যেটা দিয়েছিলাম সেটা দিচ্ছি আগে, পরে দিচ্ছি ঠোঙা-সাহিত্যের যে-গল্প থেকে নিয়েছিলাম সেটা।

সফর আলি: "আরে মোক্তার সাহেব যে! আচ্ছা, আজমলের মোকদ্দমার কি হয়েছিল?" বশীর মোক্তার: "আজমলের কোন্ মোকদ্দমা?" সফর আলি: "ঐ যে—যে মোকদ্দমায় সে তার স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল।" বশীর মোক্তার: "হ্যাঁ স্যার, সে তো বেঁচে গেছে।" সফর আলি: "হ্যাঁ, তা' জানতাম, আপনি যখন মোকদ্দমা করেছেন তখন সে বাঁচবেই; তা' কি রকম বাঁচালেন তাকে?" বশীর মোক্তার: "সে জেলে আছে স্যার! বড্ড সুখে আছে, স্ত্রীর নাগালের একদম বাইরে।"

ঠোঙার উপর যে গল্পটি ছিল সেটা ছিল ইংরেজীতে। সেটা হ'ল এই : হ্যারী মারা গেছে। হ্যারীর স্ত্রী প্লানচেটে হ্যারীর আত্মাকে এনেছে। হ্যারীর স্ত্রী প্রশ্ন করছে আর হ্যারী (মানে প্লানচেট) লিখে লিখে উত্তর দিচ্ছে। হ্যারীর স্ত্রী : "কে তুমি?" হ্যারী : "আমি হ্যারী।" হ্যারীর স্ত্রী : "আমার কথা মনে আছে?" হ্যারী : "হ্যাঁ, খুব আছে।" হ্যারীর স্ত্রী : "ওখানে কি রকম আছ?" হ্যারী : "খুব সুখে আছি।" হ্যারীর স্ত্রী : "আমাদের বাড়ীতে যে রকম ছিলে, তার চেয়েও সুখে?" হ্যারী : "হ্যাঁ, তার চেয়েও সুখে।" হ্যারীর স্ত্রী : "বেহেস্ত না জানি কি সুন্দর জায়গা।" হ্যারী : "বেহেস্ত নয় প্রিয়া, আমি দোজখে আছি।"

এখন হয়তো বুঝতে পারছেন, যাঁরা ঠোঙা পড়েন না, তাঁরা কি বিরাট সাহিত্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ও-সব দেশে ঠোঙার কাগজ আলাদা। ধবধবে আনকোরা কাগজ দিয়ে তারা ঠোঙা করে। সুতরাং পড়বার সামগ্রী তাতে থাকে না। নানা কোম্পানি এই ঠোঙা বানায়; অন্য ব্যবসায়ের মতো এতেও প্রতিযোগিতা চলে। আমাব মনে হয়, কোন কোম্পানি ও সব দেশে এই ঠোঙা-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে, সেই আনকোরা নতুন কাগজগুলোতে নানারকম সাহিত্যিক উপাদেয় ছিটে-ফোঁটা যদি ছাড়ে, তবে ঠোঙা বিক্রিতে সে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা হয়ে যাওয়ার কথা। আমাদের এখানেও কোন কোন দোকান (যেমন কাপড়, কেক ইত্যাদির) আনকোরা নতুন কাগজের ঠোঙায় দোকানের নাম খচিত ক'রে ঠোঙা ব্যবহার করেন। তাঁরা যদি এমন কিছু কিছু মজ্জতদার খুচরো সাহিত্য তাতে পরিবেশন করেন, তবে সেটা খুবই আদৃত হওয়ার কথা।

আরব্য-উপন্যাসের কাহিনীর মতো ঠোঙার ভেতর বন্দী হয়ে আছে সমাজের নানা দিককার কত কাহিনী। আপনি মন দেননি, তাই তারা ছাড়া পায়নি। একবার যদি মন দেন তবে দেখবেন, সে-গুলো শুধু হালকাভাবে পড়ার সামগ্রীতেই নয়, দেশের সুখ-দুঃখে ওতপ্রোত হাজারো ঘটনায় ভরপুর।

চায়ের দোকান

আপনি কি কখনো জলবিন্দুর মধ্যে বিশ্ব-দর্শনের চেষ্টা করেছেন? গোটা পৃথিবী তার আকাশসহ একটা বিন্দুর মধ্যে যে প্রতিফলিত হয় তা' কখনও দেখেছেন কি? এখনো যদি না দেখে থাকেন তবে সে আশা ছেড়ে দিন, I's too late, কারণ আপনার দৃষ্টিতে সে-ভঙ্গী আনতে সাধনার দরকার, কিছুটা সময় নেবে। তবে আপাতত যদি বিশ্ব-দর্শন করতে চান তো একটা চায়ের দোকানের ভেতর নজর ফেলুন।

সব চায়ের দোকান নয়, আপনাদের স্টেশনের কাছেই মোড়ের উপর যে একটা চায়ের দোকান আছে সেটাই দেখুন। দোকানটা অবশ্য শরীফি-খানদানী নয়; সকলের চাহিদা মেটানোর জন্যেই আছে ওটা। ওপরে টিনের ছাদ, চারদিকে রং-দেওয়া কাঠের বেড়া; বড় বড় জানালা ও দরজা। ভেতরে বেড়ার ওপর সিনেমার নানারকম পোস্টার।

আপনারা খেয়াল ক'রে দেখবেন সেখানকার দৈনন্দিন জীবনে পর্যা বদল হয়, অর্থাৎ দোকানটি দিনে-রাতে ভোল ফেরায়।

সোবেহ্ সাদেকে, উষার প্রারম্ভে, হাফেজ মিয়া গার্ড তড়বড় ক'রে ওঠেন, তাঁর ট্রেন ধরতে হবে। দুটো বিস্কিট চিবিয়ে এক গ্লাস পানি গলাধঃকরণ ক'রে হয় যে ক্ষুন্নিবৃত্তি, ইঞ্জিনে কয়লা-পানি ঠাসার মতোই তা' ছন্দহীন বলেই তার মনে হয়। হ'লই বা তার দৌড়-ধাপের জীবন, তাই বলে কি চায়ের চুমুকের ফাঁকে ফাঁকে বিস্কুট ভেঙে মুখে ফেলে একটা হালকা-মধুর ছন্দময় প্রাতঃরাশ করতে তিনি অধিকারী নন? তাই উঠেই ছোটেন সেই মোড়ের চায়ের দোকানে। ঘুমন্ত পুরীতে তখনো জাগরণের ঢেউ পূর্ণমাত্রায় এসে লাগেনি, দোকানের ছোকরা আব্বাস তখনো গভীরভাবে নিদ্রিত। তিনি এসেই হাঁকেন: "এই আব্বাস, চটপট উনোন জ্বালা, ডাউন ট্রেনটা এই গেল, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি।" "দুত্তোর" বলে আব্বাস প্রথমে পাশ ফিরে শোয়, পরে ওঠে ধীরে-সুস্থে। জানে আধঘণ্টা হাতে রেখে কথা বলেন গার্ড সাহেব। কয়লা তুলে দিয়ে, কেতলি মেজে চড়িয়ে দেয় চুলোয়, দিয়ে মাজতে বসে চায়ের পিরিজ-পেয়ালা।

করিম মিয়া ড্রাইভার ওদিকে প্রকাণ্ড একটা বাস এনে দাঁড় করায় লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে—এখানাই সকাল বেলায় লাইনে চলার প্রথম বাস। যে ক'দিন গার্ড সাহেবের সকাল বেলায় ডিউটি থাকে, সে ক'দিন করিম মিয়া নিশ্চিন্ত; নইলে ডাকাডাকিটা তারই করতে হয়। গার্ড সাহেব স্নান সেরে ফিটফাট হয়ে দাঁড়ান। করিম মিয়া অভিবাদন করে; গার্ড সাহেব উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পান কেতলির ঢাকুনির নৃত্যের ছন্দ। দু'জনেই খুশী, রোজকার মতো তাঁদের কণ্ঠে যুগপৎ আমেজ-ঢালা টানা আওয়াজ বেরোয়: "আব্বাস চা দে-রে—"

করিম মিয়া চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে বলে: "এই আব্বাস, খাবার কিছু আছে কি?" আব্বাস তেড়ে বলে: "এত সাত-সকালে কি আবার থাকবে?" হঠাৎ গার্ড সাহেব পকেট থেকে বিস্কিট বের করেন, ছ'খানা চাঁদ বিস্কিট। করিম মিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন: "খান না করিম মিয়া?" করিম মিয়া দু'খানা তুলে নিয়ে ধন্যবাদ দেন। মানুষ এসে জোটেনি, তাই এখনো চায়ের দোকানের পরিস্থিতিতে এঁরা আলগা হয়ে যাননি। বিকেল বেলা জমাট জনতার মধ্যে হয়তো এই গার্ড সাহেব ও করিম মিয়াই পরস্পরকে অচেনার মতোই বিচ্ছিন্ন বলে মনে করবে। এর পর আসে জাহের আলী, তোরাব খাঁ, এরা সব মিলে কাজ করে। দেখতে না দেখতে জমে ওঠে দোকানটা, ব্যস আধঘণ্টা মাত্র, তার পর এক নিমেষে সব মৌমাছির মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এরা স্রেফ চা-সেবী, নাস্তার বিলাস এদের নেই।

টেবিলের ওপর চেয়ার উলটে ঘরটাকে ধোয়া হয়েছিল, তা' এখনো শুকোয় নি, এর মধ্যেই প্রথম পর্যায়ের চা পানটা শেষ হয়েছে। সকালের এই জনতা হচ্ছে চায়ের দোকানের গ্রীনরুমের জনতা, ওদের কাছে দোকানের আবরু নেই। এবার আটটা বাজতে চলল। আর দেরি করলে চলবে না। ভদ্রলোকদের ওঠার সময় নিকটবর্তী। টোস্ট মামলেট চপ জোর বানানো চলছে। দরজাগুলোতে পরদা ঝুলানো হ'ল, চেয়ারগুলো টেবিলের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সাজানো হ'ল। ঘরের পেছন থেকে কয়েকটা ফুলের টব এনে দরজার পাশে দেওয়া হ'ল, আব্বাস পর্যন্ত একটা গেঞ্জি গায়ে সভ্য চেহারা ধারণ করল।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম নজর পড়বে আপনাদের যার উপর তিনি বড় কাজে অফিসিয়েট করা একজন পেন্সন-প্রাপ্ত কর্মচারী, জোট বেঁধে প্রাতঃভ্রমণ

থেকে বাড়ী ফেরার পথে এসে ঢোকেন। দুটো জিনিস তাঁকে ভোগাচ্ছে: একটা হচ্ছে অবশ্য ডায়বেটিস, অন্যটা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সাত বছর আগে বিয়ে করেছিলেন। পেন্সন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী বুঝতে পেরেছেন যে, মৃত্যুর হাতছানির মধ্যে স্বামী এসে পৌছলেন, তাই তাঁকে টিকিয়ে রাখতে তার সাবধানতার অন্ত নেই। চা একদম নিষেধ, তাই রেঁস্তোরায় ঢোকা বারণ।

তিনি এই চা-দোকানে ঢুকলেন সাবধানে। কোণে একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন। মালিকের পরিচিত তিনি। মালিক হাঁকল: "চিনি ছাড়া এক পিয়ালা চা।" চা এলে তিনি পকেট থেকে স্যাকারিন বের ক'রে একটু মিশিয়ে তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করলেন; বলা যায় না, কখন কে এসে পড়বে। শেষ করলেই একটা বয় চিলের মতো ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল পেয়ালা; তারা জানে তিনি কিছুক্ষণ বসবেন এবং চায়ের পেয়ালা সম্মুখে নিয়ে বসবেন না।

ওদিকে জানালার ধারে একটা ছেলে বসে আছে, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইছে আর হাসছে, হঠাৎ আবার হাসি থামিয়ে বিজ্ঞভাব দেখানোর চেষ্টা করছে, বিজ্ঞভাবটা একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ভেঙে দিয়ে একটা ফিকে হাসিতে জারিত ক'রে মনে এক অব্যক্ত ভাব আনছে তাতে, কিন্তু কোনরূপেই যেন স্থবিধে করতে পারছে না। মেয়ে স্কুলের গাড়ী এসেছে। গাড়ীর দরজা খুলল, বাড়ীর দরজা খুলল, কিন্তু কারও মনের দরজা খুলল না বোধ হয়, এত চেষ্টা সত্ত্বেও। গাড়ীটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি পকেট থেকে ছোট একখানা আরশি বের ক'রে চকিতে চেহারাটা দেখে নিল।

বাইরে কতকগুলি ছেলে বেশ একটু গোলমাল করছে দাঁড়িয়ে। তাদের বাৎসরিক নাটক হবে তার বন্দোবস্ত করতে হবে, সেইজন্য তারা ব্যস্ত। আলোচনার জন্যে বসবার জায়গার দরকার। ঢুকল তারা চায়ের দোকানটায়। এক পেয়ালা ক'রে চায়ের অর্ডার দিয়ে যেন মৌরসী-পাট্টা ক'রে নিল তাদের বসার জায়গাকে। উত্তাল বেগে চলল আলোচনা। কোঁকড়ানো-বাবরি বলল: "দেখ, আমি খাটতে রাজী আছি, কিন্তু আমাকে নায়কের পাট দিতে হবে।"

সেলের চশমা বলল: "নায়কের পাট তোমাকে। ক'বার ষ্টেজে নেমেছ?"

কোঁকড়ানো-বাবরি উত্তর দিলেন: "পাঁচবার।"

আদ্দির পাঞ্জাবি হেসে ফেলল। কোঁকড়ানো-বাবরি রেগে গিয়েই সেক্সপীয়র আবৃত্তি করল : "স্বর্গে মর্তে ঘটে যাহা বলি হোরেসিও, যাহা নাহি জান তাহা জানিয়া লইও।"

হোরেসিও চটে উঠল। ঝগড়া বাধে আর কি!

এমন সময়ে হাউই-শার্ট বলল : "আহ্হা, ঝগড়া করছ কেন? আমি জানি ও পাঁচবার নেমেছে—দু'বার মৃত সৈনিক, দু'বার দৈবারিক, আর শেষ বার মোসাহেব, তাই না?" সঙ্গে সঙ্গে সকলে হেসে উঠল, মায় কোঁকড়ানো-বাবরি।

তড়বড় ক'রে একটা লোক এসে দোকানটায় ঢুকল? ঢুকেই দক্ষিণের জানালাটা খুলে ফেলল, আর তা' দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকল, চায়ের অর্ডার দেওয়ার কথা ভুলেই গেল। বয় এসে জিজ্ঞেস করায় বলল, "হ্যাঁ, এক পেয়ালা চা, আর যা কিছু হোক আনো।"

তার দৃষ্টি দক্ষিণের জানালার বাইরে নিবদ্ধ। হঠাৎ অর্ধ-সমাপ্ত চা রেখে পয়সা দিয়ে চটপট চলে গেল। সবাই অবাক হয়ে দোকানীর দিকে চাইল।

সে বলল : "বোধহয় টিকটিকি। কাজে নজর রাখতে চা'র দোকানগুলিই সরেস কিনা—এরূপ আমরা হরদম দেখি।"

দুপুরে চায়ের দোকানটা একটা মিশ্র জটিল ব্যাপার। দুপুরের খাওয়ার সমকক্ষ একটা কিছু রাখতে হয়; অথচ পূর্ণ খেতে দেওয়ার দায়িত্ব এর নেই; সে-সব হ'ল লাঞ্চ দেনে-ওয়ালা হোটেল রেঁস্তোরার।

লাঞ্চ খাওয়াতে একটা ভাবনাহীন সুবিধে আছে; খিদে মাফিক মেনু চিহ্নিত ক'রে ফেলে দিন। একটার পর একটা কোর্স আসবে। দুটো কোর্সের ফাঁকে ফাঁকে রোলস ও মাখন দিয়ে ঠিক সিমেণ্ট করার মতো ভরাট ক'রে দেবেন ক্ষুধাটাকে। এ-রকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজটা চলবে যে, যখন আপনি খাওয়া শেষ ক'রে ছোট কফির পেয়ালায় চুমুক দেবেন, তখন বে-মালুম ভুলে যাবেন ক্ষুধার কষ্ট। কিন্তু চায়ের দোকানে অনেক কিছুতে আপনার নজর দিতে হবে; প্রত্যেক আইটেম নেওয়ার সময় নামের দিকে এত খেয়াল রাখতে হবে যে, আপনার মনে হবে ভাড়াটিয়া মোটর চড়ে মিটার দেখে চলছেন। ওতে সুখ নেই। লাঞ্চএর সঙ্গে চা'র দোকানের দুপুরের খাওয়ার তুলনা হয় না। লাঞ্চ-এ অত নিশ্চিন্ত ভাব আছে বলেই আজকাল মুরুব্বী বা পেট্রন তোষণের সর্বপ্রধান সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালবাসার

কথায় আপনারা শুনেছেন "Say it with flowers." চাকরি ও স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে এখন দাঁড়িয়েছে, "Say it with a lunch."

লাঞ্চ-এর সঙ্গে চা'র দোকানের দুপুরের খাওয়ার তুলনা না হলেও এর একটা নিজস্ব মর্যাদা আছে; এবং তাতেই এটা গৌরবান্বিত। ধরুন, আপনি এক জায়গায় কাজে গেছেন; সেখান থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে আসা একটু দরকার, বাড়ী এসে খেয়ে-দেয়ে গেলে আপনার কাজ হয় না। সেখান থেকে ফিরে, চান-টান ক'রে একটু আরামসে খেতে চান আপনি। এ-ক্ষেত্রে লাঞ্চ না হয়ে একটা add interim বা মধ্যকালীন বন্দোবস্তই আপনার পছন্দ হবে বেশী, এবং সেটা পাবেন চা'র দোকানে।

এত চা'র দোকান রাস্তার ধারে আছে বলেই ছ'টা পয়সা খরচ ক'রে, আধ ঘণ্টার জন্য আমরা বৃষ্টি থেকে মাথাটা বাঁচাতে পারি, চেয়ারে বসে রাজার হালে। সমাজের অন্য পর্যায়ের মতো এখানে সিঙ্গেল-ডবলের ভেদাভেদ নেই, একই অধিকার।

চায়ের দোকানগুলো যেন আরশি—তাতে প্রতিফলিত হয় আমাদের সমাজ-জীবন। আপনি যদি শুধু চক্ষু-কর্ণ খোলা রাখেন, তবে দেখবেন দ্বি-ইঙ্গিত বাতাবীর মতো সমাজের একটা প্রস্থচ্ছেদ আপনার সম্মুখে তুলে ধরেছে চা'র দোকানগুলো। শুনুন সেখানে যে সব কথাবার্তা হয়। ডাক্তার হলে বুঝবেন দেশের মৃত্যুর হার কি পরিমাণ রোগে ও কি পরিমাণ ডাক্তারে ভাগ ক'রে নিয়েছে। উকিল কিংবা রাজনৈতিক হলে বুঝবেন কতদিন আগে "ধরণী দ্বিধা হও" বলা আপনাদের উচিত ছিল। মাস্টার হলে বুঝবেন কর্তব্যে ব্যত্যয় কি এবং তার জন্যে খোদার কাছে ক্ষমা পেতে কতদিন সেজদায় থাকা উচিত। ইঞ্জিনিয়ার হলে বুঝতে পারবেন অমুক সালে এক কনস্ট্রাকশনে তিনতলা থেকে যে ইটখানা পড়েছিল, সেটা আপনার মাথায় পড়লে ভাল হতো, আজ আর নিজেদের সম্বন্ধে এত শুনতে হতো না। লেখক যদি হন তা' হলে মনে করবেন, আগের দিনের চায়ের দোকান এমনি ছিল না বলে দেশ সম্বন্ধে জানতে রাজদরবারে যেতে হয়েছে পর্যটকদের, শক্তিশালী লেখক হয়েও তাই তাঁরা নির্ভীক হতে পারেন নি। ফলে, আজও আমাদের ইতিহাসের লোম খুঁটতে হচ্ছে।

চা'র দোকান সম্বন্ধে এত কথা বলতে গিয়ে চা'র পেয়ালায় একটা ঝড় তুললাম।

অপ্রস্তুত হওয়া

আমরা জীবনে হরদম অপ্রস্তুত হই। 'ক'-কে 'খ' মনে ক'রে তার কাছে আচ্ছা ক'রে 'ক'য়ের বদনামি করছি, হঠাৎ জানতে পাই সে খ, ক নয়।

অমনি চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়, নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। এ হ'ল অবশ্য মোটা ধরনের অপ্রস্তুত হওয়া। এটাই আরও সূক্ষ্মভাবে হতো যদি এ রকম ঘটত : ক আমার প্রভু, তাঁকে আমি চিনি ; খ হ'ল আমার প্রভুর বন্ধু, সে কথা আমি জানি। ক' নিজের তারিফ অবশ্য খুবই পছন্দ করেন, তার পর করেন খ-এর তারিফ। আমি তাই জেনে খ-এর খুব তারিফ করলাম ক-এর কাছে। এর মাঝে ক-এর সঙ্গে হয়েছে খ-এর বিবাদ। এতদূর পর্যন্ত সেটা গড়িয়েছে যে, খ-এর কথা বললে ক চটে লাল হয়ে যান। আমার কাছে খ-এর তারিফ শুনে অপ্রত্যাশিতভাবে ক বললেন : "খ-টা জোচ্চোর, বাটপাড়, ছোটলোক।" হয়তো এই বলে উঠে চলে গেলেন। আমি অপ্রস্তুত হলাম।

এই অপ্রস্তুত হওয়াটা আগেরটার চাইতে সূক্ষ্ম হলেও হয়তো হালকা নাও হতে পারে। কি পরিমাণ মনিব চটেছেন, তা' না জানা পর্যন্ত একে হালকা বলা যায় না। আবার আগেরটা মোটা হলেও হালকা না হতে পারে। ধরুন, যে ক-কে খ মনে ক'রে তাব সামনে ক-এর বদনামি করলাম, সেই ক-এর কাছে যাচ্ছি আমি টাকা ধার করতে। রাস্তায় এ কাণ্ড ঘটে গেল।

অপ্রস্তুত হওয়ার মতন ঘটনা ঘটলেই যে লোকে অপ্রস্তুত হবে তার মানে নেই। অপ্রস্তুত হওয়াটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত. অর্থাৎ যে অপ্রস্তুত হবে তার মনের উপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া কতদূর দীর্ঘায়িত হতে পারে, তারই অবকাশের উপর নির্ভর করবে তার অপ্রস্তুত হওয়াটা। এক্ষেত্রে অনেকটা আত্মসম্মান জ্ঞানের ধারায় চলে মন। যেভাবে, 'জুতা তো মারিয়াছেই, আরও অপমান করিতে চাহে' তাকে অপ্রস্তুত করা সহজ হবে না। অনেক দিন আগের কথা। রেলে যাচ্ছি, টিকেট-চেকার এল। এক ভদ্রলোক কোন ক্রমেই খুঁজে খুঁজে তার টিকেটটা বের করতে পারলেন না। চেকারটি তাকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিল। পরে ভদ্রলোকটি টিকেট খুঁজে পেলেন

বেশ লেগে গেল ঝগড়া। এমন সময় এক স্টেশনে উঠলেন অন্য একজন। তিনি এসব দেখে খুব হাসলেন, আমরা অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি ভদ্রলোকটিকে বললেন: "আরে সাহেব, উনি যে আপনার মামাশ্বশুর হন।" আমরা সকলে একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়লাম; কারণ, যে পরিস্থিতিতে একজন অপ্রস্তুত হচ্ছে, সে পরিস্থিতি সকলকেই কমিবেশী কিছুটা বিব্রত করবেই।

তাই হঠাৎ যেন খুশী হয়ে উঠলাম। যখন দেখি ভদ্রলোক নিজেই অদ্ভুতভাবে অপ্রস্তুত না হয়ে পবিস্থিতিটা পালটে দিলেন।

ভদ্রলোকটি পরিচয় শুনে বললেন: "মামাশ্বশুর? ইডিয়ট, ছোটলোক।" চেকারটিও বাঁচালেন, বললেন: "ভাগ্নেজামাই না আমার ইয়ে—"আবার লেগে গেল ঝগড়া। রক্ষা হ'ল, আমরাও বাঁচলাম। 'তা' হলে দেখছেন ব্যক্তিগত ব্যাপার। বস্তুতঃ অপ্রস্তুত হওয়াটা অপমান হওয়ারই প্রকারভেদে।

অপ্রস্তুত হওয়া ও অপমান হওয়া যদিও সমশ্রেণীর, তবুও প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। এমন ক্ষেত্রও হতে পারে যেখানে হয়তো কারও অপমান হওয়া আপনি চান, কিন্তু অপ্রস্তুত হওয়াটা চান না। ধরুন আপনি রেলে যাবেন, উচ্চশ্রেণীর টিকেট করেছেন। বিশ্রাম ঘরে বসে আছেন। একখানি চেয়ার খালি আছে, আর দুটো চেয়ারে বসে আছেন একজন বৃদ্ধ ও সঙ্গে তাঁর সুবেশী ও স্মার্ট তরুণী নাতনী—উভয়েরই মধ্যম শ্রেণীর টিকেট। এমন সময় কর্তৃপক্ষের লোক এল, তাঁদের বলল: "দয়া ক'রে মধ্যম শ্রেণীর বিশ্রাম ঘরে যান।" তাঁরা এই উঠি উঠি করছেন। আপনি নিতান্ত অস্বস্তি অনুভব করছেন যে, তাঁরা অপ্রস্তুত হয়েছেন। অপ্রস্তুত হয়েছেন তা' বুঝতে পারছেন তাঁদের উঠে যাওয়ার গড়িমসি দেখে। নইলে তাঁরা পরিষ্কার বলতেন: "এই আমরা যাচ্ছি, প্যাসেঞ্জার তেমন নেই বলে আমরা বসেছিলাম।"

তাঁরা যদি উঠে যান, তবে আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন,—এই জন্য যে, থাকলে আবার এই কাণ্ড ঘটতে পারত। সত্যি কথা বলতে কি, স্মার্ট তরুণীর নির্বুদ্ধিতা অনেকটা আপনার মনকে আলোড়িত করেছে। এবার এই ঘটনাটা অন্যভাবে দেখুন। মাত্র দুটো চেয়ার আছে বিশ্রাম ঘরটায়। আপনি গিয়ে দেখলেন, ঐ বৃদ্ধ আর তরুণীটি দখল ক'রে বসে আছেন। আপনি নিজে উচ্চশ্রেণীর টিকেট বের ক'রে বারে বারে দেখলেন। আপনার মন বলছে, তাঁরা উর্ধ্বশ্রেণীর যাত্রী নন। কিছুই কাজ হ'ল না। আপনি অর্ধেক

তরুণীকে অর্ধেক বৃদ্ধকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—আপনারা কি উচ্চশ্রেণীতে যাচ্ছেন? তরুণী গট ক'রে বলল—সে জবাব কর্তৃপক্ষকে দেব। ডেকে আনলেন আপনি কর্তৃপক্ষকে। কর্তৃপক্ষ এসে তাদের মধ্যম শ্রেণীর টিকেট দেখে জোর ক'রে তুলে দিল। আপনি বেশ আনন্দ পেলেন। রসিয়ে রসিয়ে মনে মনে বললেন, Rightly Served। ইংরেজীতেই কথাগুলো আপনার মনে আসল ঐ স্মার্ট মেয়েটির উপরই আপনার রাগ বেশী হয়েছিল বলে। দেখুন তা' হলে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের অপমানও আপনি চাইছেন, অথচ অন্যক্ষেত্রে তাদের অপ্রস্তুতি আপনাকে দুঃখ দিচ্ছে।

একজনকে অপ্রস্তুত হতে দেখে যে অপ্রস্তুত হওয়া, সেটাকে পরোক্ষ বলা যেতে পারে। কিন্তু এই পরোক্ষভাবে অপ্রস্তুত হওয়াও প্রকারভেদে বিভিন্ন ডিগ্রীর হতে পারে। সাধারণত : কাউকে অপ্রস্তুত হতে দেখলে আমরা কিছুটা অপ্রতিভ নিজেরাও হই। অবশ্য যদি সে শত্রু না হয়। তা' হলে খুশীর বিষয়ই হয় সেটা। যদি সে হয় অজানা, তা' হলে একটা মজার ব্যাপারও ঘটতে পারে। প্রথম তার অপ্রস্তুত হওয়া দেখে যে সহানুভূতি আমাদের মনে উদয় হয়, পরে হয়তো কারণ জেনে তার এই অপ্রস্তুত হওয়াটা একটা উপভোগের বিষয়ও হতে পারে। শুনুন কি রকম। একবার আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে একজন নাম-করা লোকের ওখানে যাই। তিনি বয়সে বেশ একটু প্রাচীন। একটি যুবক তাঁর সঙ্গে কথা বলছে তুই-তোকারি ক'রে। ভদ্রলোক দেখি যেন অপ্রস্তুত হয়েছেন। আমরাও তার বেয়াদবি ও ভদ্রলোকের অপ্রস্তুত হওয়া দেখে অনেকটা লজ্জা পাচ্ছিলাম। সে চলে গেলে ভদ্রলোক হেসে আমার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ওর বয়স কত বলুন তো? আমার আত্মীয় বললেন—ত্রিশ। সে ভদ্রলোক হেসে বললেন—পঞ্চাশ। আমরা একসঙ্গে পড়েছি। ওর বড় ছেলেটি এবার হাইকোর্টের এডভোকেট হয়েছে। ওর বয়স কেউ ধরতে পারে না বলে অপরিচিত লোকদের আমার সব সময়েই এ কথা বলতে হয়, নইলে তারা মনে করবে আমি ছোকরাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করি। আমরা হেসে উঠলাম।

অন্যের অপ্রস্তুত হওয়াটা সে শত্রু হলেই যে আমরা উপভোগ করি, তা' নয়। অবস্থা বিশেষে অনেক ক্ষেত্রে নিকটতম বন্ধু হলেও করি। সে হ'ল কথাবার্তায় একজন যখন অন্যকে অপ্রস্তুত করার চেষ্টা করে। সরল ভাষায় যাকে বলে leg pulling. বাক্যবাণ চলতে থাকে, তার মধ্যে একজন

অন্তকে ধরাশায়ী করুক, এই হয় আমাদের ইচ্ছা এবং যত বেশী একজন অন্তের কথায় অপ্রস্তুত হয়, আমাদের আমোদ ততই হয় বেশী। জেদের ক্ষেত্রে এই অপ্রস্তুত করার কার্যটা এমনভাবে চলে যে, উচ্চ-নীচ জ্ঞান থাকে না; সাধারণতঃ এই জ্ঞান না থাকাটা সুস্থ মনের পক্ষে কষ্টদায়ক হয়। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই নেশার হয়ে দাঁড়ায় যে, তা সত্ত্বেও আমরা তা' উপভোগ করি। এর পেশাদারী উপমা হ'ল কবিগণ। কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবেও এটা আমাদের জীবনে ঘটে। একটা ঘটনা বলছি।

বিভাগোত্তর কলকাতা। আমার এক বন্ধু—তিনি সবে পাশ ক'রে ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপক হয়েছেন। বলে রাখা ভাল, বন্ধু হলেও তিনি ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন নন। কালো আচকানের ভীতি তাঁকে পেয়ে বসল। বেশ হাসি-ঠাট্টা ক'রে এগিয়ে যাচ্ছি হয়তো রাস্তা দিয়ে, কালো আচকান দেখলেন অমনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু এদিক-ওদিক চেয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অকৃতকার্য হলেন। ঠাস ক'রে আদাব দিয়ে বলে বসল—"আদাব স্যার।" তিনিও বেশ হেসে আদাব গ্রহণ করলেন।

তিনি আর আমি আমরা দু'জন গিয়েছি মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলা দেখতে। আমরা ঢুকেছি। কোথায় বসব? তিনি সবগুলো কালো আচকানের loci বা সঞ্চার পথ বের ক'রে সর্বদূরে একটি 'সিট' ঠিক করলেন। গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন: "বেশ ভাল হ'ল। কলেজের ছাত্র কেউ কাছে নেই। আমার আবার কথাবার্তা একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়।" আমি বললাম: "মুফতি, মানে সাধারণ পোষাকেও তো ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রেরা আসতে পারে।" তিনি বললেন: "তা ঠিকই বলেছেন। কালো আচকান ইউনিফরম হওয়ায় মাস্টারদের দশা প্রায় রেফারীর মতোই হয়েছে। কালো আচকানের বাইরে তাদের চোখ পড়ে না।" যাক খেলার ইণ্টারভালে তিনি হঠাৎ এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়া একটি কথা বলে ফেললেন। অমনি পিছন থেকে একটি ছেলে হেসে উঠল। আচকান না গায়ে দেওয়া ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র, মাস্টারের অমনি কথা শুনে যেভাবে হাসতে পারত, ঠিক তেমনিভাবে হাসল। উনি ফিরে চাইলেন, ছেলেটি মুখ টিপে হাসছেই। মনে করলাম উনি অপ্রস্তুত হবেন, শুধু আমি নয় আশেপাশের দু'চার জনই তাই মনে করল—সম্পর্কটা বুঝতে বোধহয় কষ্ট হয়নি কারও। এক মুহূর্ত মাত্র। তার পর তিনি মুখ ফিরিয়ে ছেলেটিকে বললেন: "বড্ড

খুশী হলাম, তবুও যে মন দিয়ে মাস্টারের কথা শুনেছ, ক্লাসে তো আর ও কর্মটি করো না।" সবাই মুচকে হাসল, ছেলেটি উল্টো অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

কথায় বলে লজ্জা দেওয়াও যা, লজ্জা পাওয়াও তা'। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হয় সে সব ক্ষেত্রে, যেখানে লজ্জা দেওয়াটাকে উপভোগ করা যায়।

আমাদের দেশের থানার উপরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেটার সঙ্গে আমরা জড়িত। আমি তখন ইন্টার মিডিয়েটের ছাত্র, আমাদের সেই চিকিৎসালয়ের ডাক্তার আসলেন। শুনলাম, খুবই স্মার্ট লোক। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে আমাদের বাড়ীতে চিঠি দিল সেই সংবাদ দিয়ে, আর তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। চেয়ারম্যান আমাদের চিনতেন, কেউ বাড়ীতে ছিল না, সুতরাং আমাকেই চিঠি দিলেন।

দুপুর প্রায়। আমাদের বাড়ীর পুকুরের ঘাটলায় স্নানের আগে মেছওয়াক করছি, কাঁধে একখানা দেশী গামছা। দেখি হুড় হুড় ক'রে ডাক্তার সাহের নতুন সাইকেলে এসে উপস্থিত। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: "এই, তুমি কি এই বাড়ীতে কাজ করো?" আমি বললাম: "না, আমি এই বাড়ীর ছেলে।" তিনি বললেন: "পড়াশুনা করো?" আমি বললাম: "হ্যাঁ।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "নওপাড়া স্কুলে?" নওপাড়া স্কুল, একটি মাইনর স্কুল। আমি বললাম: "ঢাকায়।" চাকর ছোকরার মতো তখন তাঁর কাছে মনে হলেও, ঢাকার কথায় তিনি যেন নিজে সামলে নিলেন। দ্বিতীয় পুরুষের 'তুমি থেকে সম্বোধনকে তৃতীয় পুরুষে উন্নীত করলেন। বললেন: "তা' কি পড়া হয়?" আমি বললাম: "আই-এস-সি।" তিনি চট ক'রে বললেন: "আপনি আই-এস-সি পড়েন?" আমি বললাম: "হ্যাঁ।" তিনি আর এগুলেন না। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন: "নুরুল মোমেন সাহেব বাড়ীতে আছেন? তাঁর কাছে একখানা চিঠি আছে।" আমিই যেন নুরুল মোমেন, এটা তাঁকে খুব অপ্রস্তুত করল। তিনি নানা রকম ইয়ে—করেলন। আমাকে চাকর মনে করায় আমি এত রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম যে, সে বয়সে গোড়াতে সব কথা ভেঙে দিয়ে এই নাটকীয় পরিবেশটা নষ্ট করতে চাই নি।

মোটের উপর অপ্রস্তুত হওয়া আমাদের জীবনে আছে বলে যে জীবনের স্বাদ আছে তাই নয়, গণ্ডারের মতো যাদের চামড়া তারাও এটাকে পিনের খোঁচার মতো ভয় ক'রে অনেকটা সামলে নেয়।

শুধু এক গানের তাল ছাড়া সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কাটাটা সৌন্দর্য-সৃষ্টিকে সাহায্য করে। নাপিতের চুল কাটায় যেমন সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তেমনি হয় লেখকের লেখা থেকে জোর ক'রে ভাব ও কথা কাটায়।

বস্তুতঃ সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রশ্ন যেখানেই আছে, সেখানে কাট-ছাঁট ব্যাপারটা দেখবেন প্রধান। সিনেমার ডিরেক্টরকে দেখুন; তিনি অবান্তর ঘটনা যত কাটবেন ততই ছবিটা মনোরম হয়ে উঠবে। তার হাতের কাঁচিটার ব্যবহারই হবে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রধান সহায়ক। এবার দরজীকে দেখুন। সেও ঐ একই শ্রেণীর: কাঁচির মারফত রূপ-রসায়ন ক'রে যাচ্ছে।

সিনেমার ডিরেক্টর ও দরজীর টেকনিক একই শ্রেণীর—বিযুক্ত ও যুক্ত করা। রেডিমেড কাপড় যে-সব দরজী করে, তাদের তো ডিরেক্টরের সগোত্র বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যাদের জন্যে তাঁরা কাঁচি ব্যবহার করছেন সেই গ্রাহকরা সব অলক্ষ্যে রয়েছে। তাদের সৃষ্ট জিনিস বাজারে নামিয়ে দিলে তাদের রুচি ও চাহিদা অনুসারে তা' কাটবে।

বিশিষ্টভাবে শরীরের মাপে কাপড় তৈরির জন্যে যাঁরা খোঁজেন বিশিষ্ট দরজী, তাঁদের শরীরের কিংবা মনের বৈশিষ্ট্য আছে। শরীরের বৈশিষ্ট্য ধরুন, সাধারণের মাপে তিনি যা লম্বা, মোটা তার চাইতে কম। যা মোটা, লম্বা তার চাইতে কম। পা'র তুলনায় শরীর বড়, কিংবা শরীরের তুলনায় পা' বড়। এমনি হাজারো রকমে তিনি রেডিমেড কাপড়ের দরজীর ফাঁদ এড়াচ্ছেন। মনের বৈশিষ্ট্য আপনার আর ধরতে হবে না, কারণ পরিধান-কারীর মন এত নিগূঢ়ভাবে প্রভাবান্বিত হয় যে আপনি তার হদিস পাবেন না। কল্পনা করতে পারেন, একটা লোক ভাল একটা রেডিমেড স্যুট পরে কোনখানে যেতে লজ্জা পাচ্ছেন বলে, অন্যের কাছ থেকে ভাল দরজীর তৈরি বেমানান একটা স্যুট ধার ক'রে পরে গ্যাট গ্যাট ক'রে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে? অথচ এরূপ হচ্ছে বলেই তো আমার এক বন্ধু (লজ্জার খাতিরে বন্ধুর উপর দিয়েই কথাটা চালিয়ে দিলাম), বিয়ে বাড়িতে জাজিম ধার দেওয়ার মতো একটা স্যুট ভাল দোকান থেকে তৈরি করিয়ে

রেখেছেন ধার দেওয়ার জন্যে, বছরে বড়-ছোট সব তা' নিচ্ছেন পরছেন, খুশী হচ্ছেন।

কথায় বলে, আপ রুচি খানা, পর রুচি পহেননা। এই পরের রুচি অনুসারে আপনি কখনো কাপড় পরেন কি? কাপড় কিনতে গেলে কিংবা বানাতে গেলে আপনি যেটা আপনার নিজের ভাল লাগে, তেমনিই কি কেনেন কিংবা বানান না? তা' করেন; কিন্তু তবু কথাটা সত্যি। হাস্ত ও নীস্ত বা ইতি-নেতির দর্শন যদি আপনার জানা থাকে তবে বুঝবেন যে পাওয়া ও ত্যাগের ভেতর দিয়েই শুধু আসতে পারে কাম্য। কিছু আপনার নিজের মত ত্যাগ করবেন অন্যের কিছুটা গ্রহণের জন্যে: এই হ'ল পর রুচি পহেননা'র দর্শন। ধরুন একটা কাপড় আপনার অত্যন্ত পছন্দ হ'ল; কিনে নিয়ে গেলেন দরজীর দোকানে; বললেন: "আমার একটা স্পোর্টস জ্যাকেট এ-দিয়ে ক'রে দাও।" দরজী বলল: "স্পোর্টস জ্যাকেট তো ভাল হবে না; আচকান এর চমৎকার হবে। আপনি আচকান করিয়ে দেখলেন যে, সত্যি তাই। দরজী অন্যের গায়ে স্পোর্টস জ্যাকেট দেখেছে, কিংবা নিজেই ক'রে দিয়ে ঠিক পেয়েছে যে ও-কাপড়ে তা' মানায় না। তা' হলে দেখছেন যে পরের রুচির ওপরও আপনার নির্ভর করতে হয়। কিংবা ধরুন, আপনি একটা ভাল স্যুট তৈরি করবেন। কাপড় দেখে আপনি বেহদ্দ হয়ে গেছেন, কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। তার পর দু'দিন কাটাচ্ছেন রাস্তা-ঘাট দিয়ে আপনার কাপড়ের চিন্তায়; হঠাৎ একজনকে দেখলেন একটা কাপড় পরেছে, চমৎকার দেখাচ্ছে। কাপড়টা হয়তো দোকানে আপনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফেলে দিয়ে এসেছেন। চট ক'রে আপনি তা' দিয়ে একটা স্যুট ক'রে ফেলে ভারী খুশী হয়ে গেলেন। এখানে দেখুন সেই ভদ্রলোকের রুচিই আপনাকে পথ দেখাল।

ইনসিওরেন্সের ডাক্তারের চাইতে দরজীরা আপনার শরীরের হাল-হকিকত কম জানে না। একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দরজীর দোকানে গিয়েছি। দরজী বলল: "কোটটায় ডান দিকের মোড়ায় একটা প্যাড দিতে হবে।" বন্ধু বলল: "প্যাড কেন?" দরজী বলল: "ডান কাঁধটা আপনার বাম কাঁধের চেয়ে নীচু।" বন্ধু অপ্রস্তুত হয়ে বলল: "নীচু। এই আপনার কাছে প্রথম শুনলাম।" দরজী হেসে বলল: 'আপনার গায়ের কোটটা খুলুন তো?" কোট খুলে দেখা গেল সেটাতে বন্ধুর অজান্তেই

একটা প্যাড দেওয়া রয়েছে। শুধু তাই নয়, বন্ধুকে বলল: "আপনার হাত দুটো ছোট-বড় আছে।" গায়ের কোটটির ও বন্ধুর হাত মেপে তা' দেখিয়ে দিল। এমনি ধুরন্ধর হ'ল দরজী।

ধুতি-পাঞ্জাবি যাঁরা পরেন তাঁরা নিজে হলেন রূপকার। কোঁচা দোলানো থেকে গিলে করা পর্যন্ত সব স্তরেই প্রকাশ করে তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কোট-পাতলুন যাঁরা পরেন তাঁরা রূপসৃষ্টিটা ছেড়ে দেন দরজীর হাতে; তাঁদের বৈশিষ্ট্য বড় জোর প্রকাশ পায় টাইয়ের গিরোয়। আমাদের মেয়েদের জন্যে ভাল একটা ব্লাউজ কাটাবেন এমন কোন দরজীর দোকান কখনো পেয়েছেন? পান নি? কেন পান নি জানেন? আমাদের মেয়েদের শাড়ী পরতে হয় এবং সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন ধরনে তাঁরা পরেন। তা' থেকে তাঁদের রূপসৃষ্টির যে অতি উচ্চ ধারণা জন্মে, তার কাছে দরজী নিরুপায়। প্রত্যেক শাড়ীর জন্যে একটি বিশিষ্ট ডিজাইনের ব্লাউজ আমাদের মেয়েদের কল্পনায় ভেসে ওঠে। বলুন তার সঙ্গে দরজী পাল্লা দেবে কি ক'রে? অথচ বিয়ের কনের ব্লাউজ দরজীই করে; কারণ বিয়ের কনের সঙ্গে ব্লাউজের কাটের একটা সমঝোতা আগেই হয়ে গেছে; দরজী তৈরি ক'রে দিয়েই খালাস; জানে যে, মেয়েরা 'কবুল' বলতেই প্রাণ কবুল; সে আর ব্লাউজের ছাঁটের কি সমালোচনা করবে।

আবার ঐ দিকে গাউন দেখুন, দিব্যি চমৎকার ডিজাইনের সব কাটা হচ্ছে; কারণ তার পিছনে শাড়ীর পটভূমি নেই; দরজীই সর্বেসর্বা। দরজীখানার বাইরে মেম সাহেবদের গায়ে চড়িয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। পুরুষের তবু টাইয়ের গিরোটা নিজের হাতে, ওদের তো তাও নেই।

দরজী যে রূপকার তার পেছনে দেখবেন অনেক সময় তার কবি-মন কাজ করছে। উদ্ধত ভুঁড়ি যাদের ব্যক্তিত্বকে ভারিক্কী দিয়েছে কোট প্যান্টে স্ট্রিমলাইন কাট দিয়ে দরজী তাদেরকে সুখদৃশ্য ক'রে তোলে। সমুদ্রগামী স্টীমারের পেছনটা—ডিমের মতো একটু বেঁকে গিয়ে তির্যক্‌ভাবে নীচে নেমে গেছে; চলার সময় নাচছে ধীরি-ধীরি—এরই যে ছন্দ তাই তারা বেমালুম চড়িয়ে দেয় এই সব লোকদের কোট-প্যান্টে।

রাজনীতিতে রাম রহিমের মত গ্রহণ করতে পারছে না কেন? কারণ রামের মত কেটে রহিমকে মজানোর মতো লোক নেই। অথচ চোরাবাজার

থেকে রাম রহিমের কাপড়টা এনে দিব্যি পরছে দরজীকে দিয়ে একটু কাটিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, দরজীর নানা রকম কাটের উপর আপনার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পেতে পারে নানা রকমে। টেলিফোনের ভেতর 'হ্যালো' বলা শুনলে যদি আমি আপনাকে জানি, তবে নির্ঘাত বলতে পারব আপনার কোন্ স্যুট টাই পরা আছে। লুঙ্গি-পাঞ্জাবি? স্যুটের 'হ্যালো'র তো খানদানী তফাত-ই আছে। তিন দিন আগের লুঙ্গি-পরা ক্রামতালি হঠাৎ দিব্যি পরিপাটি এক স্যুট পরে আপনার সামনে এসে উপস্থিত, এত স্মার্ট লাগছে যে আপনি বলেই ফেললেন: 'হ্যালো, কেরামট অ্যালী!" চাকুরি পাওয়ার মধ্যে দরজীর দান যে কত বড় তা' আমরা বুঝতে পারি তখন, যখন নিঃসঙ্কোচে আমরা আমাদের চাকুরেদের গুণাবলী আলোচনা করি। কাল রাত্রে ট্রেনে দেখা একটি হৃষ্টপুষ্ট শক্তিশালী যুবকের সঙ্গে। পরনে তার একটি চমৎকার স্যুট, কিন্তু কাট মানাচ্ছে না। কি সুন্দর যে তাকে লাগল কী বলব! শুধু মনে হতে লাগল, তার স্যুটটা যদি না পরা থাকত। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার! চমৎকার কাপড়, কিন্তু কাট এরূপ কেন? মনটা একটু খারাপও হ'ল যে ছেলেটির বুদ্ধি-সুদ্ধি কম, এমন ভাল কাপড় বাজে দোকান থেকে কাটিয়েছে। ছেলেটি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বোধহয় ভেতরের পকেট থেকে কিছু একটা নেওয়ার জন্যে সেটা এমনভাবে ঘুরিয়ে ধরল, যে আমি তার উপরে লাগানো দরজীখানার টিকেটটা দেখতে পেলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি, কারণ এটিই হ'ল বাঙলাদেশের সব চাইতে বিখ্যাত দরজীর দোকান। আমি ছেলেটির দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম।

সে বলল: "এটা আমার বাবার স্যুট। তাঁর গায়ের মাপেই কাটা, তিনি পরলে ভারী চমৎকার মানায়।"

আমি হেসে বললাম: "তবে তুমি ওটা পরেছ কেন? ভাল দরজীর কাটা স্যুট পরে স্টাইল করবে বলে?"

সে উত্তরে যা বলল তাতে আমি লা-জওয়াব হয়ে গেলাম। সে বলল, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তার নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্যে তার বাবা ওটা তাকে পরতে বলেছেন। "বাবা বলেন," বলল ছেলেটি, "তোমার ওই টিকেট দেখালেই কোন ছেলে সাহস ক'রে বলবে না যে স্যুটটা খারাপ হয়েছে; আজকালকার ছেলেরা ঐ টিকেট দিয়েই যাচাই করে, নিজের সত্যকার মতামত দেওয়ার সাহস তাদের নেই।" হঠাৎ ছেলেটি হোহো ক'রে

হেসে উঠল। আমি ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করায় বলল : "সেদিন হয়েছে কি জানেন, একটি ছেলে ছোট একটা দরজীখানা থেকে নিজের মনোমত তৈরি করা একটা স্যুট পরে এসেছে, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। আমি গিয়েছি সেখানে ; আমার স্যুট সম্বন্ধে তারা বিরূপ সমালোচনা করার চেষ্টা পেতেই আমি দেখিয়ে দিলাম টিকেটটা। ওরা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বুঝিয়ে দিলাম হালকা ঢিলেই, যেমনি আমার গায়ে আছে, এই হ'ল স্টাইল ; দরজীর টিকেট-টার পুরোদস্তুর ব্যবহার ক'রে দিলাম ; তখনই তারা বুঝে ফেলল আমার স্যুট থেকে ছেলেটির স্যুটের কাটিং যতটা তফাত ততটা বাজে, অমনিই বলল : 'বাস্তবিকই তোমার স্যুটের সঙ্গে এটার তুলনা হয় না।' তাদের ঐ ভাব দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলাম দরজীর টিকেটের সামনে তারা কিরূপ অসহায়।"

ব'লে বলল : "দেখুন, আমি এই স্যুট পরায় আমার আত্মিক সাহস বেড়ে গেছে ; কারণ যাকে এই টিকেট দিয়ে কাবু করি, তার চাইতে আমি নিজেকে বড় মনে করতে পারি।" বলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করল : "আপনিও তো বেশ ভড়কে গিয়েছিলেন, তাই না ?"

আমি বললাম : "তোমার বাবা তো বেশ বিচক্ষণ লোক দেখছি। তাঁর নামটা কি বল তো ?"

ছেলেটি উত্তর দিল : "তাঁর নাম মুরুল মোমেন।"

আমি জোরের সঙ্গে বললাম : "মিথ্যে কথা। তুমি তাকে চেনই না।"

সে বলল : "হ্যাঁ, আমি তাঁকে চিনি, তিনিই আমাকে চেনেন না।" আমি জোর ক'রে তার হাত চেপে ধরতে সে আমার স্পর্শের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি চমকে উঠলাম। আমার ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম দরজীর সম্বন্ধে কিছুদূর লিখে, বাকীটুকু চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বুঝলাম আমার অবচেতন মনের চিন্তাধারা যুবকের বেশে স্বপ্নের মধ্যে এসেছিল। বুঝলাম আজকালকার ছেলেমেয়েদের আত্মিক সাজ-সজ্জা যা দেখি তার ভেতর দেখি বিভিন্ন দরাজ হাতের কাট—সেক্সপীয়র, ইবসেন, রবীন্দ্র নাথের। যদিও দেখতে বেমানান, তবুও সেই লেবাস নিয়েই স্টাইলে ঘুরে ফিরছে। নিজের পরিমাপের কাট তারা জোটাতে পারেনি ; যারা জুটিয়েছে তারাও ওই কাটের বেলায়ই ভড়কে যাচ্ছে। এদের কাউকে দেখলে মন সেক্সপীয়রের ভাষায় বলে : "A tailor has made thee."

আজিমপুরা কলোনী

কোন কারণে বর্তমান যে ছোকরা চাকরটি আমার এখানে কাজ করে তার উপরে রাগ হয়েছে; মনে করছি আর-একটি চাকর পেলে একে আর রাখব না। ইজি চেয়ারে শুয়ে চিন্তা করছি কি ক'রে পাওয়া যায় আর-একটি বাচ্চা চাকর। হঠাৎ আমার বারান্দা থেকে আওয়াজ এল, ছোকরা চাকর রাখবেন নাকি? উঠে গিয়ে দেখি বহু ছোট ছেলেমেয়েরা খেলায় মত্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম: "কোথায় ছোকরা চাকর?" তাদেরই একজন, আমারই বন্ধুর একটি ছেলেকে দেখিয়ে বলল: "এই তো?" আমি অবাক হলাম বুঝে বলল: "আমরা খেলছি।" চাকর নিযুক্ত ক'রে তো প্রত্যেকবারই বেকুব বনে যাই; কি ক'রে, নিযুক্ত করার আগে, তার চরিত্র যাচাই করতে হয়, তা'র কোন হদিস পাই নে। মনে করলাম খলিফা হারুনর রশিদ যেমন বাচ্চাদের থেকে সত্যিকার এক বিচারে সাহায্য পেয়েছিলেন, তেমনি হয়তো কোন সাহায্য পেতে পারি তাদের কাছ থেকে; তাই ফিরে এসে চেয়ারটায় দেহ এলিয়ে দিয়ে কান সজাগ রাখলাম।

ছোকরাটি বলল: "মা, আমাকে চাকর রাখবেন?" যাকে উদ্দেশ ক'রে বলল, সেই গৃহিণীর পার্ট করছিল। সে বলল: "তুমি আগে কোথায় কাজ করেছ?" চাকরটি বলল: "অমুক নম্বর এফ-এ।" মেয়েটি বলল: "ও, আমার সইয়ের ওখানে? না বাপু, তোমাকে রাখা হবে না, তুমি একটি নেমক-হারাম; তুমি তাদের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছ তাতে তোমার মুখ দেখাই উচিত না।" ছোকরা বলল: "আমার কোন দোষ নেই, ওরাই আমাকে বিদেয় দিয়েছে।" মেয়েটি বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিল: "বিদেয় দিয়েছে! দেবে না? মাথায় ক'রে নাচবে? দোষ কর নিজে, আবার অন্যের বদনামি!" ছোকরা বলল: "আমার কোন দোষই নেই, আম্মা।" এবার অন্যেরা এ ডাকে আপত্তি ক'রে বলল: "এখনো তোমাকে রাখা হয়নি, তুমি আম্মা বলতে পারবে না।" ছোকরাটি নিজেকে সংশোধন ক'রে বলল: "আমার কোন দোষ নেই, বিবি সাহেবা।" মেয়েটি বেশ কেটে কেটে বলল: "না, দোষ নেই? রেশন আনতে গিয়ে

নতুন চাকরেরা ফেরে না, তাতে আমাদের সুবিধে হয়, পুলিস দিয়ে ধরিয়ে কোন হিল্লে করতে পারি। কিন্তু বাপু তুমি তাদের চাইতে চালাক, বললে এসে, টাকা পকেট মেরে নিয়ে গেছে ; টাকাটা তো মারলেই, আর কোন কিছু করাও গেল না তোমার বিরুদ্ধে।" ছোকরাটি বলল : "ঐ একবারই হয়েছে।" আর যাবে কোথা, "একবারই হয়েছে! রসগোল্লা আনতে গেলে একটা রসগোল্লা তোমার প্রায়ই মাটিতে পড়ে যায় না? বাচ্চা কোলে ক'রে ঘুরছ, হাতে খাবার, এদিক ওদিক চেয়ে ধাঁ ক'রে তাতে কামড় দিয়ে বসো না? বাচ্চা কেঁদে উঠলে মা-বাবাকে বলো না, পিঁপড়ে কামড়েছে তাই কাঁদছে। বুদবুদে শয়তান তুমি, তোমাকে সবাই চেনে; আজিমপুরা কলোনীতে আর তুমি চাকরি পাবে না, যাও।"

যেখানে থাকি হঠাৎ সে জায়গার নাম কানে আসায় আরও বেশী উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। মনস্তত্ত্ববিদ্ এক বন্ধু বলেছিলেন যে, বাচ্চারা বড় অনুকরণ-প্রিয়। মনে করলাম তাদের মুখে মুখে এবার আত্ম-ছবিটা দেখে নিই। চাকর ছোকরা বিদেয় হ'ল। হঠাৎ শুনি : "মাফ কবো, আর কিছু হবে না।" ভিক্ষুনী বলল : "এ কি কথা মা, দু'জন এসেছি, ছ'টা পয়সা কি হিসেবে দিলেন?" একটি মেয়ে বলল : "কেন, তোমার চাব পয়সা, আর তোমাব বাচ্চা, তার দু'পয়সা।" "একি বেলের টিকেট নাকি, যে হাফ করলেন আপনারা?" প্রতিবাদ জানাল ফকীরনি। "আপনারা বড়লোক বলেই আসি।" হেসে অন্য একজন বলল : "বড়লোক? তোমরা হাত পাতলে যা হোক কিছু পাও, তা' আবার কাউকে দিতে হয় না, আমবা হাত পাতলে পয়সা তো পাই-ই না, তার পর অন্যকেও দিতে হয়। এ কলোনীতে এসে হয়েছে এক জ্বালা, অন্যেরা মনে করে বেশ সুখে আছি।" সুখে যে নেই, তাই প্রমাণ করতেই বোধহয়, ছোট একটা বেতের চেয়ারে একজনকে চড়িয়ে ঠেলতে ঠেলতে আর একজন নিয়ে আসল। অর্থাৎ তিনি অন্যখান থেকে রিক্শায় এলেন। দাম ঠিক হয়েছে দশ আনা। পয়সা দিতে যাবে, এর মধ্যে উঠল নানা সমালোচনা : "দশ আনা রেডিও স্টেশন থেকে আজিমপুরা কলোনী!" "তা তো' নেবেই, কলোনী বললে নির্ঘাত নেবেই, কেন এতিমখানার কাছে বললে না? তাতে অন্তত দু'আনা কম নিত।" রিক্শাওয়ালা তো ভয়ানক চটে গেল, বলল : "খেলব না।" তখন তাকে এক টুকরো চকোলেট দেওয়া হ'ল; সে আবার পাশে বসে

খেতে খেতে বলল: "এই তৌবা করছি, কলোনীর লোকদের আর কোনদিন রিক্‌শায় চড়াব না।" বলে গালটা চ‌ড়িয়ে দিল।

একটা খুব ছোট ছেলে অধৈর্য হয়ে উঠছিল; অপেক্ষাকৃত বড় একটি মেয়েকে প্রশ্ন করছিল বার বার: "আপা, আমি ছেলে-রাখা চাকর কখন হবো বলো? উত্তরে মেয়েটি বলল: "সে তো রাত তিনটেয়।" ছেলেটি অধৈর্য হয়ে বলতে লাগল: "এখনই রাত তিনটে ক'রে দাও না, আপা।" কিছু পরামর্শের পর ঠিক হ'ল রাত তিনটে হয়েছে। ছেলেটি পার্ট করতে যাবে এর মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াল তার; সে বলল: "আমি ঘুমপাড়ানীর গান ভাল ক'রে করতে পারি, আমি করব না কেন? একজন মুখ ভেংচি দিয়ে বলল: "সেই জন্যেই। রাত তিনটের সময় বেসুরো গলায় চীৎকার ক'রে সকলের ঘুম ভাঙাতে পারবে তুমি? তাই এখানে দরকার।"

একজন বলল: "রাত যখন হয়েই গেল, তখন রাত এগার-বারটার খেলাও হয়ে যাক।" অমনি রাত সাড়ে এগারটা বেজে গেল। এক টুকরো কাঠের ওপর ছোট আর-এক টুকরো কাঠ ঘষা হতে লাগল, এবং একখানা কাঠ মাটিতে ঠক্ ঠক্ করা হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ ক'রে, যে জিনিস দুটো বুঝোবার চেষ্টা চলছে, তার পূর্ণতর প্রকাশের সাহায্য করতে লাগল। বুঝলাম বাটনাবাটা ও কাঠকাটা হয়েছে। নীচের ভদ্রলোকটি বললেন: "ওহ্"। মহিলাটি বললেন: "যাও সহ্য করে, কি করবে?" উপরের ভদ্রলোক বললেন: "কেন? রাত এগারটার আগে কি এ করা যায় না?" মহিলাটি বললেন: "করা হয় সাধে? সেই সাত-সকালে তো আবার ভাত চাই।" "তা' হোক অন্য সময়—" পুরুষ কণ্ঠে এই পর্যন্তই আমার কানে আসল, বোধহয় খেলার মহিলাটি ভেংচি দিয়ে থাকবেন।

হঠাৎ বারান্দায় দেখি ঝগড়া ও মারামারি। মনে করলাম সত্যিই বুঝি বাচ্চাদের মধ্যে লেগে গেল। দেখি, খেলা-খেলা। তবে বেশ জুতসই প্রকাশ হয়েছে। হঠাৎ ওদেরই একটি মেয়ে এসে আমার পাশের চেয়ারে বসে গালের সঙ্গে হাত ঠেকিয়ে, বেশ একটু চেষ্টা ক'রে রাগ-অভিমান-বিরক্তি-লাঞ্ছিত চেহারা ক'রে কাঁদো কাঁদো ভাবটা এনে ফেলল মুখে। আমি একটু পুলকিত হয়েই পরম দুঃখের সঙ্গে বললাম: "কি হয়েছে তোমার?" বলল: "আমার মাথা আর মুণ্ডু।" চুপ ক'রে রইল। বুঝলাম নিজের আগ্রহে তাদের খেলার চক্রের ভেতর নিজেকে এনে ফেলেছি; আর

থামলে চলবে না; এগিয়ে যেতে হবে। বললাম: "এখন জীবন যা হয়েছে তাতে বেঁচে থাকাই ঝকমারি—তা' হয়েছে কি?" বলল: "আমার আপা—" থেমে গেল; গলা তার ধরে গেছে যেন! সার্থক তার নকল। এক্ষেত্রে সত্যিকার জীবনে, যতদূর পারে মুখ বেজার ক'রে লোকে সাগ্রহে বক্তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকে। আমিও তাই করলাম। সে নিজেকে সামলে নিয়ে যেন বলল: "আমার আপা আজ দু'মাস আমার সঙ্গে কথা বলে না, আমাদের ছেলে-পিলেদের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে।" বুঝলাম বারান্দা থেকে ঘরে আসার মধ্যেই দু'মাস কেটে গেছে। বলল: "দশটা ঘটিবাটি একসঙ্গে থাকলে ঠোকাঠুকি লাগে; আর এতো ছেলে-পিলে; ঠিক হয়েছে, এখন মরছেন আমার সঙ্গে কথা বলতে। আমি বলব না।" আমি বললাম: "তা' বোনের সঙ্গে দু'মাস কথা না বলা—" কথাটা কেটেই মেয়েটি বলল: "বোন না, আমার বন্ধু।" আমি বললাম: "আপা বললে যে?" সে বলল: "আমরা এখানে সবাই সবাইকে আপা বলি, ছোট বড়কে, বড় ছোটকে, নইলে যে বয়স ধরা পড়বে?" আমি হেসে উঠলাম; কিন্তু সে তার এত দুঃখের মধ্যে হাসাটা পছন্দ করল না; আবার মুখটা খুব বেজার ক'রে চোখে পানি আনার যোগাড় করতেই বাইরে সিনেমার হ্যাণ্ডবিল নিয়ে বাজনা বাজিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই সুড়ুৎ ক'রে দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

এখানে সুখ-দুঃখ, ঝগড়া-ভালবাসায় জালের মতো জড়িয়ে আছে সব জীবন। এত লোকের এক সঙ্গের জীবন, রসায়নের ব্যাপারে কী যে দান করতে পারে তা' যে-কেউ কাগজ কলম নিয়ে যে-কোন বাড়ীর পোর্টিকোয় বসলে বুঝবেন। নিজেরা তো আছেই, তার উপর হকার-ভিক্ষুক-রিক্‌শাওয়ালা এর জীবনে বেশ জায়গা ক'রে নিয়েছে।

রাত্র দুটোয় হয়তো ৩২ নম্বরের সামনে কুকুরের কোরাস লেগেছে; হঠাৎ সেই দূরে এক নম্বরের সামনে ডেকে উঠল। এদেরই এক সগোত্র সম্পূর্ণ কাফেলা তীরের বেগে ছুটে গেল সেই দিকে। স্থিতি ক্ষণিক বলে মনে গ্লানি রইল না; ওদিকে সুখ-দুঃখও বাঁটোয়ারা হয়ে গেল।

আজিমপুরা কলোনী! পাকিস্তানের জন্মের পর বাধাবিঘ্ন অতিক্রমের প্রথম মাইল-স্টোনের একটি। সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রে যারা পাকিস্তানকে চালু করেছিল, তাদেরই উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সর্বপ্রথম দান।

নাটকের একটি চরিত্র

এ চরিত্রটি কোন নাটকের নয়। এতে যা আমি বলতে চাচ্ছি সে হ'ল আমি সার্বজনীন একটি চরিত্র দেখেছি, যাকে নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে সব সময়ে কল্পনা করা যায়। প্রথম আমি তাকে দেখি, এবং সত্যিই দেখি, যখন কলেজে পড়ি। আজকালও সে কলেজে পড়ছে এবং ভবিষ্যতেও পড়বে। কোন নাটক হলেই তার উপস্থিতি দিয়ে সে জমজমাট ক'রে রাখবে।

একটি ছেলে এল আমাদের হোস্টেলে ঢিলে পা'জামা, ঢিলে কোর্তা, নাগরা পায়ে। চলনে একটা দোলার ছন্দ। মনে করেছিলাম কবি, এবং ন'মাস তাই ধারণা ছিল। এর মধ্যে এল আমাদের বার্ষিক নাটক। অমনি সে বেরিয়ে এল তার স্বরূপ নিয়ে। নায়কের পার্ট থেকে ট্রায়েল দিয়ে দিয়ে যে পার্টের জন্য আর কাউকে পাওয়া যেত না, তাতে এসে সে ঠেকত।

প্রথম তার পরিচয় পাওয়া গেল এইভাবে। নির্মলবাবু আমাদের নাটক পরিচালনা করবেন। এক এক ক'রে সকলকে পরীক্ষা করছেন। ও এগিয়ে গেল, নির্মলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি আগে কোন পার্ট করেছ?" ও বলল: "হ্যাঁ স্যার, আটবার আগে স্টেজে নেমেছি।" আমরা তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালাম। সবে প্রথম বর্ষ, আটবার এর আগে যদি সে নেমে থাকে, তবে বলতে হবে ন'দশ বছর থেকে স্টেজে নেমে আসছে। নির্মলবাবু খুশী হয়ে পড়তে দিলেন নায়কের পার্টটি। বইটি হাতে ক'রে জায়গাটি দেখেই, নাচের ভঙ্গিতে গলা কাঁপিয়ে আরম্ভ করল বলা। নির্মলবাবু একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন: "তিষ্ঠ ক্ষণকাল, ও পার্ট তোমার নহে, হে পবননন্দন! ও কাঁপাকাঁপি পরে হবে বাপু, এখন অকম্পিত গলায় কিছু বলো তো।" সে বলল; কিন্তু নির্বাচিত হ'ল না। মনে করলাম ভেঙে পড়বে, কিন্তু পড়ল না। বলল: "স্যার, কুচ পরোয়া নেই, আমি রইলাম। যে পার্ট আপনার মনে হয় আমি করতে পারব, সেটাই দেবেন।" এই বলে দশ মিনিটের ছুটি নিয়ে পানি

খেতে গেল। নির্মলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: "আটবার স্টেজে নেমেছে বলল। কি পার্ট করেছে? তোমরা কেউ জান?" আমাদের আহ্মদ ছিল ওর বন্ধু এবং দেশের ছেলে। সে বলল: "আলিবাবায় দরজীর পার্ট ও করেছে। নির্মলবাবু বললেন: "কিন্তু বলল আটবার করেছে।" ছেলেটি বলল: "হ্যাঁ স্যার, আটবারই ও দরজীর পার্ট করেছে।" আমরা সকলে অবাক হয়ে যাওয়ায় সে বলল: "ছোট পার্ট কেউ নিতে চায় না। একবার আলিবাবা হ'ল আমাদের শহরে। দরজীর পার্ট করবার লোক নেই, শেষ পর্যন্ত ওকেই দেওয়া হ'ল। সেই থেকে আলিবাবা যেখানেই হতো, দরজীর পার্টের জন্য আর খুশামুদি করতে হতো না, ওকে বললেই ও করত। শেষ পর্যন্ত আমাদের শহরে আলিবাবা মঞ্চস্থ হলে কেউ ওকে বলতও না। অভিনয়ের আগের দিন নিমন্ত্রণের কার্ড দিয়ে বলত, দাদা, আপনার কাল একবার আসতে হচ্ছে আপনার পার্টটি করতে।" আমরা সকলে হেসে উঠলাম। ও ফিরে এল। বড় বড় পার্ট কিছু নির্বাচিত হ'ল। পরের দিন আবার কিছু হবে। ও এল। পার্ট সব ক'টাই চেষ্টা করল। হ'ল না কিছু। তার পর মহলা শুরু হ'ল। আপনারা যারা নাটকের মঞ্চস্থ করার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাঁরা জানেন যে, ছোট পার্টগুলো আস্তে আস্তে নির্বাচন করা হয়। কারণ ছোট পার্ট নেওয়ার লোক থাকে না। যারা নায়কের জন্য চেষ্টা করেছে, তারা মনে করে এখন ছোট পার্ট করাটা তাদের পক্ষে অগৌরবের। দু'জন নায়ক হলে তারাও হয়তো চান্স পেতো। আর যারা চেষ্টা করেনি, তারা তো মনে করে চেষ্টা করলে নায়কের পার্ট পেতোই। সুতরাং ছোট পার্ট পড়েই থাকে। আমাদের চরিত্রটি রোজই আসে। রিহার্সাল দেখে। এটা-ওটা-সেটা যা দরকার তা' করে। হঠাৎ একদিন তাকে নির্মলবাবু নাটকের দৌবারিকের পার্টটি দিলেন। ঠিক হিরোর পার্ট দিলে যে গাম্ভীর্যের সঙ্গে নেওয়া উচিত, দৌবারিকের পার্টটিও সে সেইভাবে নিল। দুটো দৃশ্যে তার উপস্থিতি আছে, তার আবার শেষেরটিতে একবার। সুতরাং একেবারে মন্দ নয়। রাত্রে এল আমার কাছে, জিজ্ঞাসা করল: "দৌবারিক মানে কি?" আমি বললাম: "দ্বারপাল।" সে বেশ খুশী হয়ে বলল: "ঠিক দিক্‌পালের মতো গাল ভরা। বেশ সম্ভ্রম-সূচক।" আমি বললাম: "তোমার পার্টে কি কি আছে হে?" সে বলল: "পার্ট বড় হলে তো বেঁচে যেতাম। এ একেবারে

Full of actions, এক জায়গায় ঢুকে একখানা চিঠি রাজাকে দেওয়া। আর এক জায়গায় এসে বলা: মহারাজ, যুদ্ধের সংবাদ খারাপ।" আমি আর ঘাঁটালাম না। বললাম: "দৌবারিক ভাল পার্ট হে।" এ দ্বারপাল যে দ্বারবান তা আর বললাম না। বললে হয়তো বলে বসত, নেব না। পরে জেনেছিলাম ও আমার ভুল। নাটক তার মজ্জাগত, পার্ট সে কেয়ার করে না, সে চায় পরিবেশ; যা-কিছু নিয়ে ঐ পরিবেশে কুড়ি পঁচিশটা দিন কাটাতে পারলেই সে খুশী। দু'দিন না যেতেই আর-একটা গুণ তার ধরা পড়ল যার জন্য আমরা সকলেই তার কাছে ঋণী ছিলাম। সেটা হ'ল তার সকল সময়ের উপস্থিতি। সুতরাং কেউ না আসলেই proxy দিতে হতো তার। আশ্চর্য! proxy যখন দিত, তখন ঠিক যেভাবে নায়ক বা অন্য যে চরিত্রের proxy দিত, ঠিক সেই চরিত্রের অনুরূপ করে বলত। এক একদিন নির্মলবাবু বলতেন: "বাপু, তুমি কাছে থাকলে ভরসা পাই। কেউ যদি অভিনয়ের দিনে অনুপস্থিত থাকে, তবে বাপু তুমি কাজ চালাতে পারবে।" পারত কিনা জানি না, কারণ মৌকা ঘটেনি, কিন্তু পরেও দেখেছি, আদিতে সে কোনদিন বড় পার্ট ম্যানেজ করতে পারত না। যাক, দৌবারিকের পার্ট নিয়ে সে রীতিমতো গবেষণা আরম্ভ ক'রে দিল। একদিন রিহার্সেলের সময় নির্মলবাবুকে বলল: "স্যার, আমাকে তো বিশেষ কোন ডিরেক্‌শন দিচ্ছেন না। দেখুন রাজার সম্মুখে দু'-দু'বার যাতায়াত করছে একজন দৌবারিক, বিশেষ একটা স্টাইল তো থাকা চাই।" নির্মলবাবু আর কিছু বিপত্তি তুলতে নারাজ। proxyর ব্যাপারে বেচারা খুব কাজে লাগছে; তার পর দৌবারিকের সোজা বাঙলাটা জানতে পারলে আবার কেটে না পড়ে। তাই বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন: "তুমিই একটা ঠিক ক'রে নাও হে, তোমাকেও যদি ডিরেক্‌শন দিতে হয়, তা' হলে চেয়ার টেবিলকেও দিতে হয় হে।" কি জানি কথাটায় আমরাও যেমন খুশী হলাম, সেও তেমনি খুশী হ'ল।

রাত্রে কামরায় শুয়ে আছি, হঠাৎ সে এল। বলল: "ঈস, পার্টটি কম লেঠার নয়। দেখ, এই entrance দিচ্ছি—এক, দুই, দুই-পৌনে"—এই বলে এক পা একবার ফেলে, অন্য পা'টা দু'বার ফেলে, আবার এ পা'টা দু'বার ফেলে, আবার এ পা'টা ঈষৎ এগিয়ে নিয়ে ছন্দটা বুঝিয়ে দিল। চট ক'রে আবার পজিশন নিয়ে, সেটা আবার দোবারা ইংরেজী ছন্দে বুঝিয়ে দিল।

One, two, two quarter এবং তেমনি এগিয়ে গিয়ে আবার চলনটা দেখিয়ে দিল। আমি তো অবাক! কি করি! জিজ্ঞাসা করলাম: "স্যার দেখেছেন?" সে বলল: "হ্যাঁ, ও কোয়াটারে এটা অনুমোদিত হয়েছে। তুমি কি বলো?" আমি বললাম: "দেখ, রাজার পার্টটা তেমন ভাল হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে তোমার এই স্টাইল তাকে খেলো ক'রে দেবে। যা হোক সে তোমার বন্ধু তো বটে। বরঞ্চ ছন্দটা ভেঙে একটা হাঁটার স্টাইল ক'রে দাও, খুব মানাবে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়—এইগুলি সংক্ষিপ্ত ছন্দের উপর ছেড়ে দাও, বেশ একটা স্টেজ-ফ্রী হাঁটা আসবে। ক'রে দেখোই।" সে করল তাই। ধীরে ধীরে তাকে নর্তন থেকে হণ্টনে আনলাম। পরে নির্মলবাবুকে বললাম। নির্মলবাবু বললেন: "বাঁচিয়েছ।"

নাটকের দিন কিন্তু সে একেবার পেয়ে বসল তার গুম্ফ লম্বা করতে, মেকআপ-ম্যান গলদঘর্ম হয়ে উঠল। পোষাক পরে রেসের ঘোড়ার মতো সে অধীর হয়ে, চঞ্চল পদক্ষেপে পায়চারি করতে লাগল। তার পর আসল সময়ে যখন গিয়ে বলবে 'যুদ্ধের সংবাদ খারাপ', তখন চিঠিটা দিয়ে চলে এল; পরে তাকে আবার পাঠান গেল। গিয়ে বলল: 'যুদ্ধের সংবাদ খারাপ।' দর্শকগণের করতালিতে ঘর ভরে গেল। এর পর শেষ দৃশ্যে চিঠি দেওয়ার কথা। মনে করলাম বলবে, "যাব না, দর্শকগণ হাততালি দেবে," কিন্তু, কিছুই যেন হয়নি এমনিভাবে এগিয়ে গেল অথচ গিয়েই ভড়কে বলল: "যুদ্ধের সংবাদ খারাপ।" বলেই গম্ভীর হয়ে বলল, "সংবাদ ভালই, তবে এই চিঠি নিন।" আবার হাততালি।

শেষ হয়ে যাওয়ার পর পাত্রপাত্রী মানে সেদিনের পুরুষ পাত্রদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে পরদা উঠল। একে একে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেও এগিয়ে এল, কায়দার সঙ্গে অভিবাদন করল এবং হাততালি পেলে সবচাইতে বেশী। এই পাগলাটে অথচ নিতান্ত স্নেহময় চরিত্র আমাদের এমেচার থিয়েটারের খানদানী এবং চিরন্তন চরিত্র। এরা না হলে নাটক জমে না। তাই বলেছি, সে এখনো কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সর্বক্ষেত্রে বিরাজ করছে।

নইলে জানি সে নেই। উপরোক্ত ঘটনার দু'বছর পরে সে আত্মহত্যা করেছিল। নির্মলবাবু তাকে স্নেহ করতেন, তাই খুব ব্যথাও পান। আমরা একসঙ্গে সব বসা। বেশ একটা থমথমে ভাব। নির্মলবাবু ঈষৎ হেসে

বললেন : "একদিন আমাকে সে এই আত্মহত্যার কথা বলেছিল।" আমরা চমকে উঠলাম। বললাম : "কবে ?" নির্মলবাবু বললেন : "গত বছরের নাটকটা যখন হয়।" সেটায় কার যেন আত্মহত্যা ছিল। সে বলল, সার, পার্টটা যদি দিতেন, তবে মা-বাবার জন্য একটা লাইফ ইনসিওরেন্স ক'রে সত্যিকার বিষ খেতাম। একেবারে জমে যেত পার্টটা। উত্তরে আমি হেসে বলেছিলাম, না হে, সে ঠিক হতো না। অভিনয়ের অত স্বাভাবিক মৃত্যুর পর সকলে যখন 'এনকোর এনকোর' বলে চিৎকার করত, তখন তড়াক ক'রে উঠে তাদের এনকোরের উত্তর না দিতে পেরে, তুমিও মনের কষ্টে মারা যেতে, আব আমাদেরও শো নষ্ট হতো।" নির্মলবাবু যেদিন এ কথা বলেছিলেন সেদিনের মতোই হাসতে গেলেন, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর মুখটি ঈষৎ মাত্র কুঞ্চিত হয়ে চক্ষু সজল হয়ে উঠল।

তা' হোক, বলেছি তো এদের মৃত্যু নেই, এরা এখনো বেঁচে আছে।

পরীক্ষার তদবির

সেদিন আমার এক বন্ধু এসে আমাকে বলল: "আমার এবার গোটা পঞ্চাশেক টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে; ঈদে একটা আচকান তৈরি করতে চেয়েছিলাম, তা' বুঝি আর হ'ল না।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "কি ঘটেছে?" সে বলল: "ঘটেনি। ঘটাতে হবে।" আমার ভাইপোর বিয়ে। আমি বললাম: "তারই বুঝি উপহার দেওয়ার কথা বলছ এই পঞ্চাশ টাকা।" সে বলল: "না হে, এ হ'ল সিঁড়ির অঙ্কের মতো। পঞ্চাশ টাকা প্রথম ধাপে রিক্শা ভাড়া হিসাবে।" "বাজার করার?" আমি জিজ্ঞেস করি। সে বলে: "না হে, গতবারের কথা ভুলে গেলে নাকি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "পরীক্ষার তদবির?" সে বলল: "হ্যাঁ, সে এবার পরীক্ষা দিয়েছে। ডিগ্রীর পরীক্ষা অর্থাৎ পাশ করলে চাকরি পাবে, চাকরি পেলে বিয়ে হবে।" বুঝলাম ব্যাপারটা।

বন্ধু হেসে দিল। ছেলেটির সব বিষয়ে এই রকম ব্যুৎপত্তি। সুতরাং যাদের কাছে তার কাগজ পড়েছে, তাদের প্রত্যেকের কাছে তাকে যেতে হবে। পঞ্চাশ টাকার মোটামুটি একটা হিসেব দিল এইভাবে: তিন বিষয়ে—তিন তিরিক্কে নয়, আর বাঙলা, দশ—এই দশটি পরীক্ষক। দুর্ভাগ্যক্রমে সবাই ঢাকাতে আছেন; তাঁদের কাছে যেতে হবে। তার উপর তিন বিষয়ে তিন, আর বাঙলায় এক—এই চারজন প্রধান পরীক্ষক আছেন; তাঁদের কাছে তো আছেই। তাঁরাই আবার খয়রাতি নম্বরের, মানে গ্রেস মার্কের গ্রেস মালিক। "মোট হ'ল গিয়ে কতজন?" বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করে। আমি বললাম: "চৌদ্দ।" সে একটুখানি ভড়কে গিয়ে বলল: "চৌদ্দ।" তা' হলে দেখ তিন চৌদ্দং বিয়াল্লিশ অর্থাৎ যদি গড়ে এদের কাছে তিন বারও যেতে হয়, তা' হলে আমার বিয়াল্লিশটি 'ভিজিট' করতে হবে। আজিমপুর, ফকিরাপুল, গেণ্ডারিয়া এমন কি নদীর ওপারেও পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: "এক এক ভিজিটে হবে না?" সে বলল: "না হে, তা হয় না। আমার এ ভাইপোটির পরীক্ষার পর প্রত্যেকবার এই কাজ করতে হয়। সুতরাং, এ বিষয়ে কিছুদিন থেকে বেশ ওয়াকিবহাল

আছি। পাওয়া না পাওয়া তো আছেই, তার পর একদিন নম্বর দিয়ে এলাম, অন্যদিন গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন—খাতা দেখিনি। আবার গেলাম, বললেন—এই দু'একদিনে দেখব। এমনিভাবে দু'চারটি ফালতু যাওয়া-আসা আছে। তার পর নম্বর জানা—নম্বর জানা মানে, তুমি তো জানো? সে না জানারই শামিল। হয়তো বলল—এই তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে পেয়েছে।" বলে আমার দিকে চেয়ে বলল: "এখন ভালয় ভালয় শেষ পর্যন্ত একা থাকলে হয়।" আমি বললাম: "কেন, অন্য আর কারও যুক্ত হওয়ার ভয় আছে নাকি?" সে বলল: "গতবার আমার দু' বোনের ছেলেও পরীক্ষা দিয়েছিল, পাশ করেনি তারা। এবারও দিয়েছে; এখন পর্যন্ত আমাকে ধরতে পারেনি। কোনদিন কঁ্যাচ ক'রে ধরবে। অমনি বিয়াল্লিশ তিন গুণ হয়ে ১২৬এ এসে দাঁড়াবে, তা' হলে এই বোজার মাসে আমার রিক্শার উপরই দিন কাটাতে হবে।" তিনটি লোক মাত্র পরীক্ষা দিয়ে একজনকে এমন গভীরভাবে পক্ষাধিককাল ওতপ্রোত রাখতে পারে, এ বেশ মজার মনে হ'ল। জিজ্ঞেস করলাম: "আচ্ছা, তুমি নিজেও তো পরীক্ষক, এই ঘোরা-ফিরিতে কাজ হয় কিছু?" সে উচ্চাঙ্গের একটা হাসি দিয়ে বলল: "কাজ? তা' হলে বলি।" এই বলে বলল: "আমার শালীর ছেলে গতবার পরীক্ষা দিয়েছিল, একটা কাগজ আমিই দেখি। তখন তার রোল নম্বর জানতাম না। পরে আমাকে জানাল। খাতা দেখে আমার অবস্থা কাহিল। যা নম্বর পেয়েছে, আমার শালীর ছেলে বলে তাকে জানলে, তা' দিতে পারতাম না। মনে হতো বেশী দিয়েছি; যা হোক চেপে গেলাম, আর ঘাঁটাঘাঁটি করলাম না। শুধু তাদের বললাম: "আমাকেও তোমাদের বলতে হবে নাকি?' যাক, সে টেনে হিঁচড়ে পাশের লিষ্টে গিয়ে উঠল। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।" বলে বন্ধুটি হেসে উঠে আমাকেই, আমার প্রশ্ন করার আগে, প্রশ্ন করে বসল: "তা' হলে জিজ্ঞেস করবে, এই ঘোরা-ঘুরিতে কি কাজ হয়?" আমিও হেসে বললাম: "একজ্যাক্টলী।" সে বলল: "হয়, কাজ হয়। সিন্নি মানলে, পাশের জন্যে নামাজ পড়লে যে কাজ হয়, এতেও তাই অর্থাৎ মনের স্বস্তি। আমাদেরও সুবিধে, পাশ ক'রে গেলে আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, আর না করলে আমাদের সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবের মন কষা-কষি হবে না। বলবে, ও-তো চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একেবারে খাতায় কিছু না লিখলে কি করতে পারে?"

বন্ধুটিকে দায়ে পড়ে তদবির করতে হয়েছে। অনেককে এরকম করতে হয়। যেমন অন্যান্য সামাজিক কাজ করতে হয়, এও ঠিক তেমনি। অন্য-ক্ষেত্রে কিছু ফললাভের আশা থাকলেও এ-ক্ষেত্রে ফললাভ হওয়া দুষ্কর। তবুও চলে আসছে; কারণ আজ যে পরীক্ষক কাল সে তদবির করছে; আপনজন ছাড়ে না, তাই। জানে, লাভ নেই, তবুও বলে, 'দেখে নম্বরটা জানায়ো।' এ রকম অনুরোধ সরাসরিভাবে করাটা অনেকটা বিব্রত করে, তাই বুঝে অনেক সময় তদ্‌বিরকারী এ রকম ভঙ্গী করে যেন নিতান্ত অন্য কাজে এসেছিল, হঠাৎ মনে পড়ল তাই বলল। একটা পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম, এমন সময় আমার এক বন্ধু হঠাৎ বাইরের জানালা দিয়ে আমাকে দেখে চীৎকার ক'রে বলল: "আরে তুমি এখানে থাক নাকি? একটা কাজে এসেছিলাম এদিকে; তোমাকে দেখলাম। তা,' তোমার দরজাটা কোন্ দিকে?" আমি বললাম: "ঢুকে বাঁ হাত দিয়ে উঠে এসো।" সে ঢুকে এসে এটা-সেটা বলতে লাগল—কতদিন পরে দেখা ইত্যাদি। এমন সময় আমার ছোট ছেলেটি এসে বলল: "বাবা, উনি ক'দিন থেকে প্রায়ই আসেন, তোমাকে পান না।" আমি বুঝলাম, আসাটা যখন এত গোপন করতে চাইছে, তখন বোধ হয় পরীক্ষার তদবিরে বেরিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হে, পরীক্ষার ব্যাপার-ট্যাপার না কি?" বলল: "না না, তোমাকে দেখতে পেয়ে এলাম। কি যে বলো! তা', কিসের খাতা দেখছো? ও! মনে পড়েছে; ওর নম্বরটা যেন কি? হ্যাঁ, ২৫৬ দেখো তো। এ তো জানি, লিখতে না পারলে কি করতে পারে পরীক্ষক, তবুও—লিখে রাখো নম্বরটা ইত্যাদি।" বন্ধু ধরনের লোকই আসে তদবির করতে, পরীক্ষক হয়েছি বলে অভদ্র হতে পারিনে, শুনি। কিন্তু কিছু কি এতে কাজে আসে? আপনারা যাঁরা পরীক্ষক, তাঁরা বেশ জানেন, কিছুই হয় না; একটি ছেলের দিকে পরীক্ষক সময়মতো নিজেই উদার হন। ধরুন, পাশের দু'এক নম্বর কম পেয়েছে, তাকে পাশ নম্বর দিতে কার্পণ্য খুব বেশী লোকে করে না। তবুও তদবির চলে। মজার কথা, যিনি তদবির করেন, তিনি যান বটে; কিন্তু পরীক্ষক তাঁর যতই বন্ধু হোন না কেন, কিছু অপ্রস্তুত ভাব নিয়েই যান। আবার পরীক্ষকও, কেউ তদ্‌বির করতে এলে, তেমনই অপ্রস্তুত হন। যদিও তদবিরকারক নম্বর দেন এবং তিনিও নম্বর নিয়ে বলেন: "আবার তুমিও আরম্ভ করলে একাজ!" ফলে গিয়ে বিশেষ তফাত হয় না। পরীক্ষক শেষ

পর্যন্ত পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরটি গ্রহণ করেন। কিন্তু এমন একটা ভাব করতে হয় অনিচ্ছার, যা তাকে পরে খেলো করতে পারে।

বহু আগের ঘটনা। এক প্রধান পরীক্ষকের বাসায় বসে আছি। তাঁরই এক বন্ধু এসে বলল : "এই নম্বরটি রাখো তো। নিজেই খাতাটি দেখে দিও। ও নাকি boldly উত্তরগুলো লিখেছে, ভাল হলেও হয়তো পরীক্ষকের সঙ্গে না মেলায় কম নম্বর পেতে পারে, তাই তুমি দেখে দিলে যা হোক বোঝা যাবে ঠিক নম্বর পেয়েছে।" প্রধান পরীক্ষকটি বললেন : "দেখ, তুমি ভাল ভাবে জান, এ রকম অনুরোধ 'রুলের' বাইরে।" বন্ধুটি খুব হেসে বললেন : "রুলের বাইরে, বল কি হে? বরং এ নম্বরটি যে দিলাম, তার জন্য কৃতজ্ঞ হও। যে কাগজ দেখবে, তার চাইতে যেগুলো দেখবে না, তাতে হয়তো দেখার জিনিস বেশী থাকবে। তাই মনে করি, এমন একটা কেস—যা তোমার নিজেরই ধরে দেখা উচিত ছিল। এই যে দিলাম, এতে যদি দেখো তার সত্যিই খুব ভাল নম্বর পাওয়া উচিত অথচ পায়নি, তা' হলে তোমাকে কর্তব্য কাজে সাহায্য করলুম বলে আমাকে ধন্যবাদ দেবে।" এই বলে নম্বরের স্লিপটা প্রধান পরীক্ষকের হাতে দিলেন। তিনিও নিলেন। তার পর পকেটে রাখলেন। যাওয়ার সময় বন্ধুটি বললেন : "দেখি স্লিপটা ঠিকমতো পকেটে রেখেছ তো? প্রধান পরীক্ষক হেসে বললেন : "এই তো।" দেখি অন্য স্লিপ। তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে অন্য একটি বের করলেন, সেটাও দেখি উনি যেটা দিয়েছেন, তা' নয়। শেষ পর্যন্ত হেসে ভদ্রলোক পাঞ্জাবির প্রায় দুই পকেট বোঝাই স্লিপ বের করলেন। কিছু মাটিতে পড়ে গেলও; তা' আর তুললেন না। আমি আর আগন্তুক দু'জনে হাসতে লাগলাম। তিনি বললেন : "দেখো, এই হয় নম্বর দেওয়ার দশা। আমরা নিজেরা তো ঠিকই দরদ দিয়ে দেখি, তা' সত্ত্বেও এত লোকের নম্বর দেওয়ার কোন মানে হয়? অথচ লোকে বোঝে না। মনে করে, বুঝি নম্বর দিয়ে গেলে কিছু সুবিধে হবে।"

সুতরাং, আপনারা দেখছেন আমার বন্ধু তার ভাইপোটির জন্যে তিন চোদ্দং বিয়াল্লিশ রাউণ্ড যে ঘুরছেন, তাতে তার যা কর্মশক্তি ব্যয়িত হচ্ছে, তার ফল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ মানসিক সান্ত্বনা মাত্র যে চেষ্টা করা গিয়েছিল। দুটি' ভাগ্যে, তারা এখনো ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই ১২৬শের পাল্লায় পড়েনি। যে এক-আধ নম্বর হয়তো এদিক ওদিক হয়,

তাতে এ ঘোরাঘুরি সার্থক হতে পারে না; অর্থাৎ ফেল করবে যে ছেলে, সে করে; পাশ করবে যে, সে ফেল করে না।

সবচাইতে গুরুতর হ'ল যখন পরীক্ষার্থী সরাসরি পরীক্ষকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। অবশ্য সেখানে পরীক্ষক তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার অনায়াসে করতে পারেন, তার নম্বর কাটার ভয় দেখাতে পারেন, বলতে পারেন: 'কিছু করব না, চলে যাও।' অনেকে যায়, অনেকে দাঁড়িয়ে থাকে; অনেকে, বিশ্বাস করুন, কেঁদেও ফেলে। অবশ্য তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করাটা কিছুই কঠিন নয়; কারণ কাঁদা দেখলেও নম্বর যখন বাড়ানো যায় না, তখন দুটো ভাল কথা বলে বিদেয় করলে কিছু যায় আসে না। দু'বছর আগে থেকে একটি ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছিল। আমারই ছাত্র, ক্লাসে চিনতাম না। ফাইনাল পরীক্ষা প্রথমবার দেওয়ার পর চিনলাম, অর্থাৎ আমার এখানে এসে উপস্থিত হ'ল। অন্যান্য পরীক্ষার্থীর চাইতে ছেলেটিকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন লাগল। কি রকম, বলছি। আমি ঘর হতে বেরিয়েছি; আদাব দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। কুশলবার্তা জিজ্ঞেস ক'রে হঠাৎ বলে উঠল: "এবার স্যার অমুক বিষয়ের প্রশ্ন খুব সোজা হয়েছে, আমি তো একেবারে সব মুখস্থ লিখে দিয়েছি।" বলে সত্যি সত্যি প্রায় উত্তরগুলো একরকম মুখস্থ বলল। বলা বাহুল্য, আমিই ঐ বিষয়ের পরীক্ষক। আমি একটু পুলক অনুভব করলাম; কিন্তু কিছু বললাম না। সে নিজ থেকে তার নম্বর বলে চলে গেল। বাড়ীতে এসে খাতাটি দেখলাম, ফেল করছে। কিছু কিছু লিখেছে বটে; কিন্তু যেগুলো সে রাস্তায় মুখস্থ বলল, তার বেশীর ভাগই দেখলাম তৈরি ক'রে লেখা এবং ভুল লেখা। মনে হ'ল, পরে সে মুখস্থ ক'রে আমাকে এই বোঝাতে চেয়েছিল যে, সে সব জানে, এবং ভালভাবেই পড়েছে। যাক, সে ফেল করল। পরের বারও সেই এক কথা। এসেই একটুমাত্র ভণিতা ক'রে গড় গড় ক'রে মুখস্থ বলে গেল। বলল: "স্যার নজর রাখবেন।" কিন্তু ফল সেই এক। তবু একটা জিনিস দেখলাম: অর্থহীন মুখস্থ হলেও ছেলেটি পড়াশুনা করেছে। তার পরের বার পরীক্ষা দিয়ে যখন আমার সঙ্গে দেখা করল এবং তার স্বভাব অনুযায়ী মুখস্থ বলা আরম্ভ করল, তখন আমার অত্যন্ত কষ্ট লাগল। আমি বললাম: "দেখ, তুমি আমার কাছে ভাল নম্বর পাও নি, ফেল করার মতো।" সে বলল: "কেন স্যার? আমি তো সবই প্রায় মুখস্থ লিখেছি।" আমি বললাম: "মুখস্থ লিখলেই হয়

না।" এই বলে অন্য ভাল দুই-তিনটি ছেলের উত্তর তাকে পড়িয়ে শুনালাম এবং তার নিজের উত্তরও পড়লাম। সে বুঝতে পারল তফাতটা। অবশ্য আমি প্রত্যেকবার বিভিন্ন খাতা থেকে নানা রকম উত্তর ক্লাসে পড়ে শোনাই, সে হয়তো উপস্থিত ছিল না।

এবারও সে পরীক্ষা দিয়েছিল। এসে বলল : "স্যার, এবার আমি ভাল করেছি।" আমি বললাম : "হ্যাঁ।" সে বলল, "কী ক'রে জানলেন ?" আমি বললাম : "তোমার নম্বরটা আমি পরীক্ষার হলে দেখে মনে রেখেছিলাম। গতবার যে দু'চারটি ভাল খাতা দেখিয়েছিলাম তাতে ফল হয়েছে।" সে ঐ বিষয়ে শতকরা সত্তর পেয়েছিল। যে ছেলেটি তদবির ক'রে পাস করার চেষ্টায় প্রত্যেকবার ব্যর্থ হয়েছে, সে এবার নিজগুণে বেশ করেছে। সুতরাং পরীক্ষার তদবিরের চেয়ে তার মূলে অর্থাৎ পড়াশুনার তদবিরে যদি মুরুব্বিগণ খেয়াল দেন বেশী, তা' হলে সত্যিকার উপকার হয়।

আমার এক অধ্যাপক বন্ধু একটি টেকনিক বেশ হাসিল করেছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যদি কেউ আসেন, নম্বর দেন, তবে অম্লান বদনে তা' গ্রহণ করেন। কিন্তু তার এক শর্ত যে, পরীক্ষককে বলবেন শুধু, নম্বর জানতে চাইবেন না। তিনি বলেন এতে সুবিধে এই যে, পরীক্ষকের কাছে যদি নাই যেতে পারেন তো লোকসান নেই। কারণ, যা নম্বর দেওয়ার তা' পরীক্ষক দেবেনই ; আর যদি যানই, তা' হলেও লোকসান নেই। কারণ, পরীক্ষকের কাছ থেকে নম্বর জানতে না চাইলে তাঁকে বিব্রত করা হয় না। তিনি যা করার তা' করতে পারেন। কিন্তু অনেক গার্জিয়ান এসব জানেন বলে নম্বরের জন্য চাপাচাপি করেন। মনে করেন, অন্তত নম্বর জানতে চাইলে পরীক্ষকের কাছে যাবে।

তদবিরটা একটা সামাজিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে এত তদবিরের চেষ্টা আমাদের দেশে হয়। দেখুন, যেখানে আপনি বললেন 'না, ও পাশ করতে পারেনি।' সেখানে বলছেন 'না, ওর কিছু করা গেল না।' যেখানে বেশ পাস ক'রে গেছে, সেখানে আপনি বলছেন, 'এবার তো দিলাম, ভাল মতো পড়াশুনা করতে বলবেন।' অর্থাৎ যদিও আপনি নির্বিকার, তবুও এসব কথাগুলো আপনি ব্যবহার করেন একটু বাহাদুরী নেওয়ার জন্যে। সুতরাং লোকেও আপনাকে পেয়ে বসে। তা' ছাড়া ধরুন আপনার বড়-লোক আত্মীয় হঠাৎ এই উপলক্ষে আপনার বাসায় উপস্থিত হন। আপনার

পরম শত্রু গায়ে পড়ে আপনার সঙ্গে সুমিষ্ট ব্যবহার করেন। আপনার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের গুঞ্জনে আপনার বাড়ী ভরে ওঠে। আপনার পকেট ভরে ওঠে স্লিপ-এ এবং তাদের মন আপাতত তৃপ্তিতে। তার পর যে পাস করার সে পাস করে, যে ফেল করার সে ফেল করে।

ঈদের সংখ্যার জন্য এটি লিখলাম বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, সামাজিক দেখাশুনার মধ্যে বিশেষ আগ্রহসহকারে পরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে কাউকে যেন আমরা লক্ষ্য না করি। পরীক্ষক যেন আত্মীয় হিসেবেই আমাদেরকে দেখতে আসতে পারেন এবং আত্মীয় যেন পরীক্ষক হয়ে না দাঁড়ান। সতত প্রদত্ত গ্রেস মার্কের খাটো কাপড় যদি আমাদের সন্তানদের মূর্খতার আবরু না রাখতে পারে, তবে দ্বারে দ্বারে দুর্ভিক্ষের বস্ত্র ভিক্ষা ক'রে সন্তানদের যেন এই ঈদের দিনে না সাজাই। দশ আত্মীয়ের বাড়ী ঘোরার পর পরীক্ষক ঘাম মোছার জন্য রুমাল বের করতে গিয়ে যেন দশখানা স্লিপ ফেলে হাস্যাস্পদ না হয়ে ওঠেন। তাঁকেও হাসিখুশীভাবে ঈদ করতে দিন, খোদার উপর ভরসা রাখুন, ছেলে আপনার আপনিই পাস ক'রে যাবে—অবশ্য যদি পাস করে।

আমি ও আমার লেখা

আমার লেখার সঙ্গে আমি আছি বলে যে মুশকিলে পড়তে হয় তার সম্বন্ধেই বলছি, অর্থাৎ ধরুন: আমি যদি বেনামীতে লিখতাম, এবং সবার সঙ্গে আমার নিজেরই একজন সমঝদার পাঠক, চাই কি সমালোচক হতাম, তা' হলে ধীরে-সুস্থে আমার সম্বন্ধে অন্যের খাঁটি মত জানতে পারতাম। বিরূপ মত থাকলে তর্ক দিয়ে তাকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করতে পারতাম। এরকম কত কিছু করার অবকাশ থাকত। কিন্তু আমার লেখায় আমি এত প্রকাশ হচ্ছি, বিশেষতঃ এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধে, যে লোক প্রবন্ধ ছেড়ে অনেক সময় আমাকেই ধরে বসে। আবার তেমনি আমিও তাদেরকে এমনি ধরে বসি, যে আমার লেখাকে ভাল না স্বীকার ক'রে উপায় নেই।

দেখুন, আপনাদের মধ্যে যে কেউ ভাল লেখেন, তিনি অনেক রকম চিন্তা ক'রেই লেখেন। সুতরাং যদি হঠাৎ কেউ সেই চিন্তাধারাটা না বুঝে, কিংবা উল্টো বুঝে, জিনিসটাকে খারাপ মনে করে, তা' হলে আপনি কতখানি চিন্তা ক'রে সেটা লিখেছেন এবং সেই চিন্তার ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে সেটা প্রকাশ করেছেন সেটা শুধু তাকে বুঝিয়ে দিলে, সে মানতে বাধ্য হবে, যে আপনার লেখার মধ্যে যতটা বোঝার ছিল তা' সে বোঝে নি। যে কোন চিন্তার ব্যাপারে এসব খাটে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: নবান্ন নাটক একবার পরিচালনা করলাম। দুর্ভিক্ষের একটি দৃশ্যে কতগুলি ভিখারী ও ভিখারিনী জড়ো করা হয়। তার মধ্যে একটি ভিখারিনীর পরনে ধোপদুরস্ত একখানি শাড়ী ছিল। পরের দিন নাটকটির সমালোচনা বেরোয়, সব-কিছু ভালর মধ্যে সমালোচক যে মারাত্মক দোষ পান তা' হ'ল ভিখারিনীর ধোপ-দুরস্ত কাপড় পরা এবং সেটার উপর নির্ভর ক'রে ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখেন: "ভিখারিনীর ধোপ-দুরস্ত কাপড় দেখে মনে হয় নুরুল মোমেন সাহেবের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় কখনো হয় নাই।" অর্থাৎ ভদ্রলোক তো এ ব্যাপারটা বোঝেনই নাই, তা' ছাড়া আমার 'নেমেসিস' নাটক-খানাও পড়েন নি, যেটা পড়লে মনে হবে স্বয়ং দুর্ভিক্ষ অনাহারে ধুঁকছে। হঠাৎ

ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা রেডিওতে অর্থাৎ এমন একদল লোকের সামনে যারা আমার শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। ভদ্রলোকও সেটা জানেন বলেই এগিয়ে এসে আলাপ জমানোর চেষ্টা ক'রে বললেন: "আপনার নাটকের যে-সমালোচনাটা করেছি, দেখেছেন?" আমি তাঁকে হাতে পেয়ে অপরিসীম আনন্দে বললাম: "ও আপনি, আপনাকেই আমি খুঁজছি।" ভদ্রলোক ব্যাপার না বুঝে যে রকম আনন্দে হাসতে পারেন তাই হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কলকাতায় কোন নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন কিনা, পৃথিবীর নাম-করা নাটকগুলি সব পড়েছেন কিনা, সমালোচনার কোন স্ট্যাণ্ডার্ড বই পড়েছেন কিনা, সব কিছুতেই তিনি 'নেতি' বাচক মাথা নাড়লেন। তখন আবার তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আমি যে নাটক লিখি এবং তা' যে বহু-প্রশংসিত তা' তিনি জানেন কিনা, লণ্ডনে বি, বি, সি-তে আমি যে আমাদের শিশু বিভাগ পরিচালনা করায় অনেকের সংস্পর্শে এসেছি তার খবর রাখেন কিনা এবং বিলেতে ও ফরাসী দেশে যে আমি নাটক দেখেছি, আমি যে নিজে নাটক লিখি, আমি যে প্রায় সব ভাল ভাল নাটকই পড়েছি, ও যে আমি সেইজন্য ঢাকাস্থিত নাটক-না-পড়া বিদেশের নাটক-না দেখা যে কারও চাইতে নাটক বোঝার বেশী শক্তি রাখি, সে আমি পরিচালনা করার সময় বুদ্ধি খরচ ক'রে বোঝার মতো কিছু যে দিতে পারি তা' তিনি বিশ্বাস করেন কিনা—এই সবের উত্তরে তিনি 'ইতি' বা 'হ্যাঁ' বাচক ভাবে মাথা নাড়লেন।

তখন আমি তাঁকে বললাম: "এবার তা' হলে শুনুন, কেন আমি সেই ভিখারিনীকে ধোপ-দুরস্ত কাপড় পরিয়েছিলাম।" এই বলে যা বললাম তা' এই: ঐ দৃশ্যে সকল ভিখারী-ভিখারিনী ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পরেছিল। ধোপ-দুরস্ত কাপড় যে ভিখারিনীটি পরেছিল তার গায়ে ময়লা ও ছেঁড়া ব্লাউজ ছিল। দুর্ভিক্ষকে আরও নগ্ন রূপে দেখানোর জন্যে ওটা করা হয়। পুরো দুর্ভিক্ষ তখন, একটি মেয়ে ডাকল, 'ফ্যান দাও, বাবু।' ঢাকায় মিউজিয়মের মধ্যের বাড়ীটায় আমি তখন থাকতাম, বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেলাম। গায়ে ঐ ব্লাউজ ছাড়া সম্পূর্ণ নগ্ন প্রায়। আমার স্ত্রীকে বললাম একখানা কাপড় দিতে। আপনারা সবাই জানেন, ময়লা ভাল কাপড় ফেলে রাখা হয়, কিন্তু ময়লা ছেঁড়া কাপড় ধুইয়ে এনে রাখা হয়। সুতরাং টুটাফাটা কাপড় যা দান করা হয় তা' ধোলাই থাকে।

যাঁরা দুর্ভিক্ষের বা প্লাবনের জন্য কাপড় সংগ্রহ করেন তাঁরা এটা ভাল ক'রেই জানেন। সেইজন্যেই মেয়েটিকে ধোপ-দুরস্ত ছেঁড়া কাপড় দেওয়া হয় যাতে মনে হতে পারে, এর আগ পর্যন্ত তার পরনে যা ছিল তা' তার লজ্জা ঢাকত না। ভদ্রলোক ঢাকা স্টেজের একজন সত্যিকার ভাল অভিনেতা, জিনিসটা বুঝে বললেন : "সাত্য স্যার, এত চিন্তা করিনি, ভুল করেছি। এবার থেকে আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রে নেবো।"

উপরে যে উদাহরণটি দিলাম, তা' প্রত্যেক লেখকের সম্বন্ধেই খাটে। অর্থাৎ একজন লেখক যদি ভাল লেখেন, তা' হলে তার যে লেখাটা ভাল লাগল না, সেটাকে সরাসরি খারাপ না বলে বোঝার চেষ্টা করা উচিত, কেন ভাল লাগল না। তার পর শেষ পর্যন্ত দেখে মতামত প্রকাশ করা উচিত। আমার লেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেখানে প্রাপ্তব্য—অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে পাঠক আমার সদা-সহচর বন্ধু-বান্ধবগণ—সে ক্ষেত্রে হঠাৎ মত প্রকাশ করা একটা বাতিকের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। আমরা যখন লিখি তখন নানা রকম চিন্তা ক'রে লিখি, চারিদিক থেকে আক্রমণ হতে পারে সে ভয়ও থাকে। কিন্তু যখন শিক্ষককে স্বয়ং সামনে পাই, তখন অনেকটা খোশালাপের প্রবৃত্তিতে একটা মত প্রকাশ ক'রে দিই। তাতে লেখক হেসে চুপ ক'রে থাকতে পারেন, বুঝিয়ে দিতে পারেন যে তিনি ভুল করেছেন কিংবা অন্য প্রথা অবলম্বন করতে পারেন, যেমন আমি কখনো কখনো করি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : আজাদে আমার 'অপ্রস্তুত হওয়া' বলে একটা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বের হয়। বিশেষ ক'রে পরিষ্কারভাবে মতামত দেন আমার দু'টি বন্ধু, ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন ও মিস্টার আবদুল হাই (বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। দু'চারদিন পর ঐ বিভাগের একজন অধ্যাপক আমাকে বললেন, এ রচনাটি ভাল হয়নি। আমি বললাম, আমি তাঁর কথা মেনে না হয় নিতাম যদি না তাঁদের বিভাগের আবদুল হাই সাহেব একে হঠাৎ 'অপূর্ব' না বলে বসতেন। তিনি আমাকে বললেন, এতে অপূর্ব বলার কি আছে? আমি বললাম, মনস্তত্ত্বের নাকি সূক্ষ্ম রসায়ন এতে রয়েছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি মনে করি। আমি বললাম, লেখকের লিখে দায়িত্ব শেষ, তা' নিয়ে তর্ক লেখক করে না। খারাপ বলুন, আমার আপত্তি নেই।

কথাটা সত্যি তাই, আমি কি করতে পারি? বড়জোর ভাল লিখতে পারি, কিন্তু সেটাকে ভাল বলে বোঝার শক্তি দেওয়া তো আমার হাতে নয়, ওটা স্বয়ং খোদার হাতে। তিনি যদি কাউকে তা' থেকে বঞ্চিত করেন, তবে আমি কি করতে পারি। আর আমার সব লেখা সকল সময়ে সকলেরই যে ভাল লাগবে, কিংবা সকলের সকল ভাল-লাগাটা আমারই যে ভাল লাগবে, এমন কোন কথা নেই। ধরুন আমার বন্ধুর কথা। আমার লেখা তার ভাল লাগা আমার একটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়; আমার লেখার ব্যাপারে তারও সেই সম্বন্ধ এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আমার কোন জায়গা আমি যেমনি মনে করেছি সুবিধের হয়নি, অমনি সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে প্রশংসায়। ফলে বার বার এ কথা বুঝিয়ে দেওয়ায় সে একদিন আমার অন্য একটা লেখার খুব দোষ ধরে মত প্রকাশ করল এবং এবারও সে আগের মতোই ভুল করল। আমি বললাম: "কি হে, এ-লেখাটা ভাল লাগল না, শেষে নিজের বদনামী করবে নাকি?" তখন সে বলল: "কি করব, তারিফ করলেও তুমি সহ্য কর না।" বন্ধুটি কবি হিসাবে জিনিয়াস এবং বন্ধু হিসাবে খুব দরদী, কিন্তু তাই বলে বলি না যে, সমালোচনার আসর যা' আগে থেকে অকৃতীর ভিড়ে দম বন্ধ হয়ে ওঠার মতো হয়েছে, সে আসরে নেমে ভিড় বাড়িয়ে অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে থাকবেন সারাক্ষণ।

ধরুন, এর থেকে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে: সমালোচক ও লেখক এর মধ্যে কে তাঁর লেখাকে বেশী ভাল বিচার করতে পারেন? উত্তর হতে পারে উভয়েই পারেন এবং উভয়েই পারেন না। অন্যের লেখার সঙ্গে যেখানে বিচার করতে হয়, হয়তো সেখানে লেখক পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে নিজের লেখার উপর অবিচার করতে পারেন। অবিচার করতে পারেন মানে, লেখাকে অপেক্ষাকৃত ভাল বলতে পারেন, আবার অপেক্ষাকৃত খারাপও মনে করতে পারেন। ধরুন, আমার লেখা 'রূপান্তর' আনন্দ বাজারের যে শারদীয় সংখ্যায় বেরিয়েছিল, অমলা দেবীর 'চাওয়া ও পাওয়া'ও সেই সংখ্যায় বেরোয়; ওটাকে আমার নিজের লেখার চাইতে অনেক ভাল লেগেছিল, কিন্তু সে কথা বলায় ওঁদের অনেকেই এমনভাবে হাসলেন যে, আমি আর এগুতে পারলাম না। অন্যের লেখার সঙ্গে তাঁর লেখা তুলনা করার সময় লেখকের বিচারশক্তিকে সন্দেহ করা যেতে পারে, কিন্তু তাঁর নিজের লেখার মধ্যে

কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ সে বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। কোন্ কথাটা তাঁকে অপূর্ব অনুভূতি দিয়ে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল তিনি তা' নিজেই জানেন। তাঁর কোন্ লেখা অত্যন্ত চিন্তা-প্রসূত, কোন্‌টা একেবারে বিনা ক্লেশে এসেছে তার হদিস শুধু তিনিই জানেন ; তাঁব চিন্তাধারার কতটুকু তিনি কোন্‌টায় প্রকাশ করতে পেরেছেন, কতটুকু অপ্রকাশিত থেকে তাব ভিতবে কেঁদে মরছে সে সবের সঠিক খবব তিনিই বাখেন, সুতরাং যদি লেখাটা তাঁরই হয়, তবে তার সার্থকতা ও ব্যর্থতা তিনি বুঝবেন সবচাইতে বেশী। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা আমরা অত্যন্ত পছন্দ করি এমন কবিতাও তাঁব নিজের অনুমোদন পায়নি দেখে বিস্মিত হই বটে, কিন্তু মনে করি, তাঁর দিক হতে ঠিক।

একটা ঘটনাব কথা বললে ব্যাপারটা বোধগম্য হবে। লণ্ডনে জয়নুল আবেদীনের চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছিল। আমরা সব দেখাশুনা করছিলাম। জয়নুল আবেদীন নিজেও উপস্থিত ছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের একজন আর্টক্রিটিক এলেন। আমার সঙ্গে ঘুরে দেখছিলেন। একটা দুর্ভিক্ষের ছবি ছিল, ডাস্টবিনের ছবি। নীচে একজন মরে পড়ে আছে। ডাস্টবিনের সঙ্গে একটা গ্যাসেব বাতি ছিল, বাতিটি একটি লোহার থামের উপর এবং থামের দু'পাশে দুটো লোহার ডাণ্ডা বের করা ছিল, মই লাগিয়ে ওঠার জন্যে। অনেকটা ক্রুসের মতো দেখা যাচ্ছিল থাম আর ডাণ্ডা মিলিয়ে। ক্রিটিক ভদ্রলোকটি সেখানে এসে অভিভূত হয়ে পড়লেন। আমাকে বললেন : "বেশ শক্তিশালী চিত্রকর। বাতিটি আমদানী করেছেন ক্রুসেব প্রতীকখানার জন্যে। ক্রুসের নীচে মৃত্যু একটা শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।" আমি জয়নুল আবেদীনকে ডেকে আনলাম, তাঁর কাছেও তিনি ঐ কথাই বললেন।

জয়নুল আবেদীনের কুণ্ঠিত বিনয় ঈষৎ হাস্যে যে স্বাভাবিক সম্প্রসারণ হয়, তাই আশা করলাম দেখতে এবং এক ঝলক দেখলামও যেন, কিন্তু মুহূর্তে মনে হ'ল হাসিটি রূপান্তরিত হয়ে সূক্ষ্মভাবে জটিল হয়ে মোনালিসার হাসিতে পরিণত হ'ল। ভদ্রলোক চলে গেলে একটা ঘরোয়া সচ্ছল হাসি দিয়ে জয়নুল আবেদীন ফিরে এলেন নিজের মধ্যে। বললেন : "কি কাণ্ড দেখলেন তো। স্কেচের সময় বাতিটা পড়েছিল বলেই এঁকেছিলাম, এবার দেখুন সমালোচকদের বুদ্ধির পাল্লা।"

এখন ধরুন, যদি ঐ ছবিটা ওরূপ শাস্তির ইঙ্গিত আছে বলে বিখ্যাত হয়ে যায়, তা' হলে জয়নুল আবেদীনের সত্যিকার শক্তি ওতে যাচিত হবে কি ? এবং তিনিও কি তাতে শান্তি পাবেন ? সুতরাং ঐ চিত্রখানা ওজন্যে যত বড়ই হোক, তিনি এটা গ্রহণ করতে পারবেন না। কোন স্রষ্টাই তা' পারে না। যদিও প্রত্যেকেই মনে করে ভাল যখন বলছে চুপ ক'রে থাকি, দেখি কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

লেখকগণ নিজেদের দোষ যে নিজেরা ঠিক পান না তা' নয়, বরং তাঁরাই সব চেয়ে বেশী ঠিক পান। আমার নিজের লেখা আমাকে এ পর্যন্ত তেমন খুশী করতে পারেনি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, আমি যদি বলি লেখাটা ভাল হয়নি, তা' হলে আমি যেটুকুর জন্যে ও কথা বললাম সেটুকু হয়তো বাদ পড়বে এবং যেটা সত্যিকার ভাল হয়েছে সেটাই নিয়ে সমালোচকগণ টানাটানি করবেন। রূপান্তরের শেষের দৃশ্যটা আমার কাছে মনে হয় ছোট। তাই বলেছিলাম যে, দৃশ্যগুলো ঠিক মতো ব্যালান্সিং হয়নি। বলেছিলাম আমার এক খুঁত-সন্ধানী আত্মীয়ের কাছে। দু'চার দিনেব মধ্যেই শুনলাম সে বলে বেড়াচ্ছে যে, রূপান্তরটা কিছু হয়নি। এই আত্মীয়টি খুঁত অন্বেষণকারীদের নিখুঁত সংস্করণ, সুতরাং এদের জব্দ করা খুব সোজা। কিরূপে শুনুন। আমার এক বেয়ান চা'য়ে দাওয়াত করেছিলেন আমাদেরকে, আমার ঐ আত্মীয়টিও ছিল। তার যে খুঁত ধরার এমনি অভ্যাস তা' জানা ছিল আমার বেয়ানটির। পুডিং দিয়েছেন, তাকে একটু জব্দ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যে ক'রে বললন : "বলুন তো পুডিংয়ে কি দোষ হয়েছে ?" আমরা সবাই বললাম : "কেন চমৎকার হয়েছে।" ও বলল : "না না, আমি ঠিক পেয়েছি কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।" বেয়ান জিজ্ঞাসা করলেন : "কি ?" সে বলল : "চিনি বেশী হয়েছে।" সকলে মাথা নাড়ায় বলল: "উত্তাপ কড়া হয়েছে।" আবার সকলে 'না' করায় সে বলল : "এবার ঠিকই বলব। ডিম নষ্ট ছিল।" বেয়ান বললেন : "প্রায় ঠিকই বলেছেন, ডিমের সম্বন্ধেই। তবে নষ্ট না।" সে অত্যন্ত খুশী হয়ে বলল : "তা' হলে ডিমের অন্য কিছু দোষ নিশ্চয়ই হয়েছিল।" বেয়ান হেসে বলল : "ঠিকই বলেছেন।"

তখন ও অত্যন্ত উল্লিসিত হয়ে আমাদেরকে বলল : "দেখলে তো, ডিম সম্বন্ধে ঠিকই বললাম কিনা ?" এই বলে খুশী হয়ে বেয়ানকে জিজ্ঞাসা করল : "এবার বলুন ডিমের কি দোষ ছিল ?" বেয়ান বললেন : "ডিমগুলো বাকী আনা হয়েছিল।" আমরা খুব হেসে উঠলাম।

এই কথাটাকে একটু দর্শন-গভীর ক'রে সাহিত্যে প্রয়োগ করলে বলা যেতে পারে, পূর্ববঙ্গে আলোচনা ব্যাপারটা অনেকটা এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আগে থেকে, কার লেখা ভাল, কার লেখা খারাপ, সেটা সমালোচকের মন ঠিক ক'রে নেয়, তার পর তার কলম চলতে থাকে সেই অনুসারে। মন ঠিক ক'রে নেয় মানে প্রথমেই মনের উপর যে ছাপ পড়ে, তাকেই আত্মস্থিত ক'রে নিয়ে মন অগ্রসর হয়। পরবর্তী চিন্তাধারা তাকে পুনরায় যাচাই করার শক্তি ও ইচ্ছা থাকে না। তাতে ব্যাপার গিয়ে দাঁড়ায়, লেখক কি বলতে চান তার দিকে সমালোচকের খেয়াল থাকে না, সে কি চায় সে দিকেই ঝোঁক হয় বেশী। সুতরাং লেখাটার সমালোচনা হিসাবে দামী হওয়ার প্রশ্ন উঠে না, তবে পঠিতব্য হয় সমালোচনা সাহিত্যের ভাষা প্রয়োগের ফলে। অর্থাৎ যে আসল জিনিসটা পড়ে নাই, সে সমালোচনা পড়ে মনে করে চমৎকার। কিন্তু যদি আসলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেত কিংবা যদি আসলের উদ্দেশ্য যাচাই করা যেত, তা' হলে অন্যরূপ ফল হতো। ধরুন, একজন সমালোচকের গত ঈদের বিশেষ সংখ্যার সম্বন্ধে লেখার কথা। অন্যের সম্বন্ধে কি বলেছেন তার কথা বলছি না, আমার সম্বন্ধে কি লিখেছেন সেই কথা বলছি। এবং বলছি এই জন্যে যে, আমার লেখার ভেতর যেভাবে আমি আছি, তাতে তিনি আমি না হওয়ায় আমার, আমার-নিজ সমালোচনা, আমার-সমালোচনা হতে সমৃদ্ধতর হবে তাঁর এই আশা করি।

তিনি লিখেছেন "দরদী মনের মৃদু বিদ্রূপের তির্যকচ্ছটা বাক্-ভঙ্গীতে যে দ্যুতি ও স্পন্দন সৃষ্টি করে, মুকুল মোমেনের তা' স্বাভাবিক সম্পদ। কিন্তু বাক্-বৈদগ্ধ যেখানে গভীরতার জীবন রসে পুষ্ট, তার আস্বাদন মুকুল মোমেন সাহেবের এই দুই প্রবন্ধে নেই।" প্রবন্ধ দুটি হ'ল 'লেখার খেলা' এবং 'পরীক্ষার তদবির।'

প্রথমে ধরা যাক 'লেখার লেখা'। আমরা তখন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে পড়ি। আহমদ চৌধুরী নামে আমার এক বন্ধু ছিল। সে সিগারেটের ধোঁয়া মুখে পুরে ভক্ ভক্ ক'রে ছেড়ে সুন্দর সুন্দর রিং তৈরি করত, সেগুলো প্রায় সাত সেকেণ্ড ধরে ভাসত ঘরের মধ্যে। চমৎকার হতো। এমন আর দেখিনি। বহু বছর ধরে সাধনা ক'রে এটা শিখেছিল ; অনেকেই এটা দেখতে আসত। একবার একজন এলেন, দেখে বললেন : "কি লাভ এতে ?" আহমদ চৌধুরী বলল : "হ্যাঁ, এগুলো সোনার রিং হলে আমারও সুবিধে হতো,

আপনাদেরও দু-একটা দিতে পারতাম।" অন্য একজন বলল : "তা' হলে ওটা সস্তা হয়ে যেত।" আবাক হয়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন : "কি রকম?" সে বলল : "সকলেই ওটা পারত, আহ্‌মদ চৌধুরীর আর দরকার কি ছিল?" রস সৃষ্টি করতে হলে তাকে গভীরতার জীবন রসে পরিপুষ্ট করতে হবে, তার কি মানে আছে? সমালোচক মহোদয় হঠাৎ ওটা আশাই বা করলেন কেন? আমি কোন কথা দিইনি তাঁকে, যে জীবন রসে পরিপুষ্ট ক'রে ওটা লিখছি? বরং 'খেলা' কথা ব্যবহার করেছি, যাতে নাকি জলকেলির কথাটাই মনে আসে, গভীরতা মাপার জন্য ডুবোডুবির প্রশ্ন ওঠে না। ঈদের দিনে আচকানটি গায় দিয়ে ফুর্তিতে ঘুরছি, অত্যন্ত হালকাভাবে যা দেখছি তাই বলছি। এখানে গভীর জীবন রস নেই, নইলে যে ক্রামতালীর আজকে পোলাও কোর্মা খাওয়ার জন্য দশদিন উপোস ক'রে থাকতে হবে, সেও খুশী মনে খেয়ে যাচ্ছে। যাকে আগামী কাল ঘৃণায় স্পর্শ করবেন না তাকে আজ কোলাকুলি করছেন, কোথায় জীবন রস? সব মিলে এক অস্বাভাবিক হালকা উচ্ছলতায় সব ভাসছে। ধরুন, আমি যদি 'লেখার খেলা' নাম না দিয়ে 'জীবন রস পরিবর্জিত হালকা লেখা' ওটার নাম দিতাম, তবে সমালোচক কি করতেন? তখন একই মাত্র প্রশ্ন হতো, লেখাটা ভাল লেগেছে কিনা? এটারও যদি উত্তরে 'হ্যাঁ' মিলত, তা' হলে বোঝা যেত, এটা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তার পর প্রশ্ন হতো অন্য কেউ এটা লিখতে পারতেন কিনা? যদি উত্তরে 'না' হতো, তা' হলে সমালোচক এইটুকু বলেই শেষ করতে পারতেন : "দরদী মনের মৃদু বিদ্রূপের তির্যকচ্ছটা বাক্-ভঙ্গীতে যে দ্যুতি স্পন্দন করে, নুরুল মোমেনের তা' স্বাভাবিক সম্পদ।" ওর বেশী বলে তার আর ছন্দ-পতন ঘটানোর প্রয়োজন হতো না।

লেখার খেলা সম্বন্ধে এবার আসল কথাটি বলি। আপনারা যাঁরা পড়েছেন, অন্য কিছু বাদ দিলেও তাঁরা একি মনে করেন না যে, অত ছোট লেখাটায় যতটা হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে, তা' একক যে-কারও পক্ষে অসম্ভব? এমন কি আমার পক্ষেও। সেটাই উচ্ছ্বসিত হয়ে সমালোচকের বলা উচিত ছিল। তা' বলেন নি। অথচ ঐ লেখাটার আমি কি করেছি জানেন? একটা Best jokes-এর বই নিয়ে তার থেকে চার-পাঁচটা বেছে সেগুলোকে পাকিস্তানী অনুশীলন করেছি। কারণ, অপূর্ব আমারই লেগেছে সেই হাস্যরসগুলো এবং মনে হয় যথেষ্ট পরিমাণে আত্মজও হয়েছে। একদিন আসলের সঙ্গে অনুশীলনী-গুলো পাশাপাশি রেখে আপনাদের দেখাব, তা' হলে বুঝতে পারবেন।

এবার পরীক্ষার তদবির সম্বন্ধে ধরা যাক। ওটা বাক্-বৈদগ্ধ গভীরতর জীবনরসে অত্যন্ত পরিপুষ্ট। গত ঈদের আগে আশা-নিরাশায় উদ্বেলিত পরীক্ষার্থিগণ, তাদের অভিভাবকগণ কি পরিমাণ অস্থিরতার সঙ্গে এই তদবির কার্যে লেগেছিলেন এবং সামাজিক সম্বন্ধ কতদূর পরিমাণে পিষ্ট হচ্ছিল তা' জানেন তাঁরা, যাঁদের এই তদবিরের বিপাকে পড়তে হয়েছিল। আমার এক বন্ধু, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সে, তারই মেয়ের নম্বর জানার ব্যাপারে এমনি আমাকে ভুল বুঝল যে, আমাদের জীবনের বড় কোন বিপর্যয়ও তেমনি করতে পারেনি। ট্যাবুলেটরগণ নিজেদেরকে সমাজচ্যুত করলেন। বাড়ীতে থেকে বলতে শুরু করলেন বাড়ী নেই। তারও ঔষধ বেরুল, মেয়েরাও আসতে লাগল বাড়ীতে। চারদিকে একটা অস্বস্তি। কবে ফল বেরুবে আর সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, এমন একটি ভাব। এই অস্বস্তিকর পরিবেশে আমার 'পরীক্ষার তদবির' বেরুল। একটা ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, যা' লিখেছি তা' ঠিক কিনা। আমি 'হ্যা' বলায় সে এত মন মরা হয়ে গেল যে, আমার দুঃখ লাগল। বোধ হয় খুব তদবির ছিল। দেখা হ'ল ডাক্তার ওসমান গণির সঙ্গে, বললেন: "মোমেন সাহেব, অপূর্ব জিনিস লিখেছেন, মনে হচ্ছে আমাদের যাঁরা পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত তাঁদের এই ক্ষণিক জীবনের কথাগুলোকে ভাষা দিয়েছেন।"

মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার খালেকও ঐ একই কথা বললেন। মোটের উপর পরীক্ষার সঙ্গে যাঁরা সম্পর্কিত ছিলেন, তাঁরা সকলে বললেন তাঁদের জীবনের এই অংশটা অত্যন্ত গভীরভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এর পর আমি আর কি করতে পারি বলুন? গোড়াতেই বলেছি, ভাল না হয় লিখলাম, কিন্তু বোঝানোর ভার তো আর সব ক্ষেত্রে নিতে পারিনে।

"আমি ও আমার লেখা"—এটা লিখছি আপনাদের শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিতে যে, ওপাশে আপনারা আছেন মনে ক'রে যখন আমি লিখি, তখন দয়া ক'রে এ পাশে আমি আছি এটা মনে ক'রেই সেটা পড়বেন। অর্থাৎ যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন যে, বুঝতে পারছেন না, তা'হলে ধরে নেবেন যে বুঝতেই পারছেন না। দয়া ক'রে মনে করবেন না, আমি ভুল লিখেছি। কারণ, ঐ ভুলটাই আমার শুদ্ধ লেখা।*

* এই প্রবন্ধে উল্লিখিত লেখা দুটি এই পুস্তকেই আছে।

থ্রি এক্‌স্‌

একটা কথা চিন্তা ক'রে দেখেছেন কি, যে কোন বিষয়ের বোঝাটা যদি ব্যক্তিমুখী হয় অর্থাৎ আপনাকে বোঝানোর জন্য যে-কথা, সেটা যদি শুধু আপনার ইচ্ছামতোই বুঝতে অবকাশ দেওয়া হয় তা' হলে দু'রকম ভুল হতে পারে?

কারণ, ঠিক বোঝাটাকে যদি অবশ্যম্ভাবী করতে হয় তবে বক্তব্যকে বিষয়মুখী করতে হবে, তবেই হবে কথিত বক্তব্যের সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট উপলব্ধির সমন্বয়। উপমা দিয়ে বলা যেতে পারে বক্তব্য ও উপলব্ধিকে নিরপেক্ষতার লাগাম জুড়ে সমভাবে চালালেই তবে বোঝাটা সঠিক পথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা।

নইলে যেমন বললাম তেমন ঘটতে পারে অর্থাৎ দু'রকম ভুল বোঝা যেতে পারে। প্রথমতঃ ঠিক বুঝে ভুল বোঝা, দ্বিতীয়তঃ ভুল বুঝে ঠিক বোঝা। দুটোই ভুল বোঝার শামিল এবং দুটোই যে ভিন্ন ফল দিতে পারে তা' উদাহরণ দিলে আশা করি পরিষ্কার হবে।

একরাজা ডাকলেন এক জ্যোতিষকে। হাত দেখালেন। জ্যোতিষ বলল: "মহারাজ, আপনার সামনেই আপনার আত্মীয়-স্বজন মারা যাবেন।" রাজা ভয়ানক রেগে তাকে শূলে দিলেন। ডাকলেন অন্য জ্যোতিষকে। সে বলল: "মহারাজ, আপনি পরম সৌভাগ্যবান, আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজন হতে দীর্ঘায়ু।" রাজা ভারী প্রসন্ন হয়ে তাকে উপহার দিয়ে বিদেয় করলেন।

বস্তুত কথা দুটো একই। প্রথম উপায়ে বলায় রাজা তাকে বুঝলেন ঠিকই, কিন্তু ঐ সঙ্গে নিজে যে তাদের চেয়ে দীর্ঘায়ু এ কথাটা সম্যক বুঝতে না পারায় তার পক্ষে ভুল বোঝা হ'ল। এবং তার ফল হ'ল উল্টো। আবার দেখুন প্রথম কথার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় কথাটা ঠিক বোঝায় ভুল বোঝারই শামিল হ'ল। কারণ প্রথমবার রাজা আত্মমুখ হয়ে চিন্তা করলেন বটে, কিন্তু নিজেকে বাদ দিয়ে; দ্বিতীয়বার আবার চিন্তা করলেন শুধু নিজেকে ধরেই। যদি বিষয়মুখী চিন্তা দিয়ে জিনিসটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন তা' হলে দু'রকম ফল হতো না।

সেইজন্যেই থ্রি এফ্‌স্‌-এর আলোচনা আমি বিষয়মুখী ক'রেই করব। নইলে আমাদের ইচ্ছামতো বুঝবার অবকাশ এতে দিলে বর্মার উপর অন্যায় করা হবে। থ্রি এফ্‌স্‌ আমাদের দেশেও একটা বিশিষ্ট রূপে বর্তমান দেখি, যদিও এর বৈশিষ্ট্য প্রথম ঠিক পাই বর্মা মুলুকে।

বিষয়মুখী করলে তাদের সঙ্গে আমাদের নিজেদের ও বিচার করার অবকাশ পাব বলেই এটাকে বর্মা মুলুকের শুধু না ক'রে সকলকে জড়িয়ে লিখছি।

একটু বলে রাখা প্রয়োজন যে, কেউ এটা পড়ে যেন অতিথি-বৎসল বর্মার সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ না করেন। সত্যিকার কথা বলতে কি বর্মার সম্বন্ধে সামগ্রিক ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ যে-বই লেখার অপেক্ষায় আমার মনে তৈরী হয়ে আছে, এ হ'ল তারই একটি ছোট পরিচ্ছেদ। সুতরাং সেই বই পড়ার আগে কেউ যদি বর্মার সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব ধারণ করেন তবে তার উদ্দেশ্যে বলি তাঁরা ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ পড়ে শেষটা অনুমান করার মতোই অসম্ভব ভুল করছেন।

এবার থ্রি এফ্‌স্‌-এ আসা যাক।

রেঙ্গুনে পৌঁছে দেখি ছাত্রদের ইউনিয়নের নির্বাচন খুব তোড়জোড়ে চলছে। কম্যুনিস্ট, সোস্যালিস্ট ইত্যাকার গোটা চারেক সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শের পার্টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। চারদিকে দেদার ইশ্‌তাহার। সেগুলো লেখা বর্মা ভাষায়, কিন্তু পার্টির সংক্ষিপ্ত নামগুলো ইংরেজীতে। আর একটা জিনিস ইংরেজীতে লেখা আছে, সেটা হ'ল, 3Fs. তার আগে-পিছে বর্মা অক্ষরে কি লেখা আছে যেন। প্রত্যেক পার্টির প্রাচীর-পত্রগুলোর উপরিভাগে এই থ্রি এফ্‌স্‌ লেখা; সুতরাং বুঝলাম যে, নির্বাচনে আশ্বাসবাণীর দফাওয়ারীতে এটাই প্রথম। কি হতে পারে এই 3Fs. যা নাকি প্রত্যেক দলই সর্বপ্রথম বলে গ্রহণ করেছে? নিশ্চয়ই এটা এমন কোন সার্বজনীন চাহিদার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ যা আমাদের বিদেশীর পক্ষেও না জানা ক্ষমার্হ না হতে পারে। সুতরাং চেপে গেলাম প্রশ্নটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানলাম।

থ্রি এফ্‌স্‌ মানে তিনবার ফেল: three failures. শুনলাম বর্মাভাষায় ওর পূর্ব ও পরে যা লেখা আছে তার মানে: আমরা 3Fs.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। ক্রমে ক্রমে জানলাম যে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে বার বার তিনবার যদি কেউ ফেল করে, তা' হলে তার ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি

ঘটে। তাকে আর পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয় না এবং পুনরায় ভর্তি হতেও দেওয়া হয় না।

আমাদের এখানে থ্রি এফ্‌স্ আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম ঠিক ওদেশের মতো নয়, তবে ঐ গোত্রের একটা কিছু আছে বটে। অনার্স পরীক্ষায় 3Fs. আছে, কিন্তু সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকে বাতিল ক'রে দেয় না। অকৃতীকে আবার নিম্নতর শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে পাসের জন্য পঠিত বিদ্যার জাবর কাটার সুযোগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ উৎসাহী যে, তার পক্ষে এক চত্বর নীচে থেকে আর-একবার ঘুরে ওঠার ব্যবস্থা আছে। শুনে তারা অনেকটা উল্লসিত হ'ল, কারণ মনে করল সমাজ ব্যবস্থায় আমরা অনেকটা বেশী অগ্রসর। কিন্তু এই উল্লাস একেবারে হাততালিতে পরিণত হয়েছিল যেদিন একটি ছাত্র সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই 3Fs.-এর উল্লেখ ক'রে বলেছিলাম আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট ক্রসের কথা; যিনি সতেরো বার পরীক্ষা দিয়ে বি-এ পাস করেছিলেন। বি, এ-তে তখন যথা ইচ্ছা পরীক্ষা দেওয়ার বাধানিষেধ যা ছিল তা' ছিল লঙ্ঘনীয়।

থ্রি এফ্‌স্ কেন যে তাদের নির্বাচনী প্রচার-পত্রের প্রথম দফা দাবি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল তা' বুঝলাম কয়েকদিন পর। পার্টি-খানা-জলসা এইসব মিলন ক্ষেত্রে 'আপনি কি পড়েন' এ প্রশ্ন ক'রে প্রায়ই এই ধরনের উত্তর পেয়েছি : "দু'বার বি-এ ফেল করেছি, একবার আই-এ ফেল করেছি, এবার আবার পড়ছি।" খুব ভাল ছেলেরও দেখা হয়েছে। কিন্তু ফেল করা ছাত্রই বেশী। অর্থাৎ ভোটারের তালিকা তারাই ভারী করেছে। শুনলাম শতকরা দশ-বারো, এমনি পাস করে। একটা জিনিস আমার খুব ভাল লাগল, সেটা হ'ল ছেলেমেয়েদের এ সম্বন্ধে সরলতা। কোন্ 'ইয়ারে' আপনি পড়েন? এ প্রশ্ন করলে আমাদের দেশে দু'তিন বার ফেল করা ছাত্রও এমনভাবে 'ইয়ারটা' বলবে যেন সে এই বছরই পাস ক'রে ঐ 'ইয়ারে' উঠেছে। দরকার করে না, তবুও ওরা ক'বার ফেল করেছে বলে। এমন কি মেয়েরাও। এবং ভবিষ্যতে যে কি হবে তার জন্যে উদ্বিগ্নতাও প্রকাশ করে। ওদের জাতীয় চরিত্রে যে একটি সরলতা আছে, যা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে বুঝেছিলাম, এতেই তার প্রমাণ পেলাম।

আমাদের যে-ফেল তাদের থ্রি এফ্‌স্-এর সমপর্যায়ের ছিল, সেটা ছিল First M. B পরীক্ষায় দু'বার ফেল। ছাত্র-জীবন খতম। তাদের কে

First M. B.র কথা বলে এইটুকু বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদের ফেল-পাসের রকমারি ব্যবস্থায় যেটা তাদের নিকটতম ছিল, সেটা ঐ। কিন্তু সে নিগড় ছাত্রের ছিন্ন করেছে। সব পরীক্ষা থাকতে ওটাতেই শুধু ফেল করলে ছাত্র-জীবন খতম হতো কেন?—একথা জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তর দিতে পারিনি। মানে ইচ্ছে ক'রেই দিইনি। তারা একটু হতাশই হ'ল। কি কারণে ওটা করা হতো এবং কি কারণ দেখানোয় ওটা তুলে দেওয়া হ'ল, এ জানতে পারলে তারা হয়তো তাদের দাবিকে আরও দৃঢ় করার ভিত্তি খুঁজে পেতো।

বলুন কি জবাব দিতে পারি? প্রথম এম, বি, পাস করার পর শুনেছি শিক্ষার্থিগণের ক্লিনিক্যাল কাজ করতে হয়; হাসপাতালের কাজও তখন তারা করে এবং রুগী-টুগিও এই প্রথম ডাক্তারের মতোই ঘাঁটাঘাঁটি করার অবকাশ পায়। অর্থাৎ ডাক্তারী বিদ্যায় পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করার আগে এই অবস্থাটা ছিল বোতল-কণ্ঠি; bottle neck। এখানে যদি ফেল-করা ছাত্রদের একটা জটলা হয় তা' হলে যারা ছাত্র হিসাবে হাসপাতালে সাহায্য করতে পারে তাদের সংখ্যা কমে যাবে; সেই জন্যেই বোধহয় এখানে 2Fs-এর গজ চালিয়ে কণ্ঠকে চালু রাখা হতো। 2Fsতুলে দেওয়ায় এই কণ্ঠটা রোধ হয়ে হাসপাতালের কাজগুলো অনেকটা হাঁপিরুগীর অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে হয়তো, কিন্তু উৎসাহিদের ভবিষ্যতে অগ্রসর হওয়ার পথে যে পাঁয়তারা করার অবকাশ দেওয়া হ'ল এটাই বা কম কি? কিন্তু একথা তাদের বলি কি ক'রে?

যাকগে ও-সব। এখন আসল কথায় আসা যাক। যে দেশেরই হোক না কেন, শুধু ছাত্র আন্দোলন করার একটা প্রশস্ত উপায় ছাড়া 3Fs-এর কোন সামাজিক দাম আছে কি? অর্থাৎ ফেলের বাধা তুলে দিলেই কি সব ছেলে পরীক্ষা দেবে?

উত্তরে বলা যেতে পারে সব ছেলে তো দূরের কথা, শতকরা দশ-জনই তিনবারের পর পরীক্ষা দেবে কি না সন্দেহ। শুধু তাই নয়, এদিকে থ্রি এফ্‌স্‌ তুললেই ছাত্র-সমাজের অন্য রকম মাথা-ব্যথা এসে যাবে; অর্থাৎ গার্জিয়ানরা তাড়া দিতে থাকবেন; তা' বাপু তিন-চারবার ছেলেরা কি ফেল করে না, অত অল্পে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন?

এ ঠিক যে ফেল ক'রে আবার চেষ্টা করার অবকাশ থাকলেই কেউ আবার চেষ্টা করবে, এ ধরে নেওয়া কোন কাজের কথা নয়। রবার্ট ব্রুসের

কথা একবার চিন্তা করুন। সপ্তমবারের চেষ্টাটা সামান্য একটা মাকড়সার কাছে উৎসাহ পেয়ে করতে হয়েছিল; নইলে তো ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজের থেকে আর কে কত পারে বলুন? 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর' কিংবা ইংরেজীতে সেই Try Try Again এইসব কবিতাগুলো যে ক্ষেত্রে থ্রি এফ্স্ নেই, সে ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়ার জন্যেই তো লেখা হয়েছে। এবং যে ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে কবিতা পর্যন্ত লেখা হয়, ধরতে হবে সে ক্ষেত্রে উৎসাহের অভাব। থ্রি এফ্স্ উঠে গেলেই উৎসাহও পড়ে যাবে। অভাব সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে উৎসাহ বাড়ে তার একটা ঘটনা বলি। যুদ্ধের কলকাতা। নিউমার্কেটে গিয়েছি। দেখি বিরাট একটা লম্বা 'কিউ'। আমার এক বন্ধু দেখি দাঁড়িয়ে আছে সেই কিউতে। জিজ্ঞাসা করলাম: "কি জিনিস দিচ্ছে হে?" সে অম্লান বদন বলল: "জানিনে।" আমি বললাম: "আশ্চর্য।" সে বলল: "কেন? এত লোক যখন দাঁড়িয়ে আছে তখন নিশ্চয়ই এমন কোন জিনিস দিচ্ছে যার খুব অভাব।" অর্থাৎ যখনই মন মনে করবে আর পাওয়া গেল না বুঝি, তখনই পাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠবে।

এবার ধরা যাক যারা সত্যিকার উৎসাহী তাদের কথা, এই যেমন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট ব্রুসের সমগোষ্ঠী যারা, তাদের কথা। উৎসাহ থাকলেই এগানো যায় না। আমি একটি ছাত্রের কথা জানি, যে নাকি পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে তিন বছর ফেল করার পর তার পিতা ঢাকায় এসে জানলেন ক্লাসে তার স্থিতিশীলতার কথা। তার পর তাকে নিয়ে গেলেন বাকি যে দু'-একখানা জমি বিক্রি করার বাকী ছিল সেগুলো দেখাশুনো করাব জন্যে। পিতা শুনেছিলেন আর তিন বছর পডলেই একটা পাস হয়ে যাবে, তাই কষ্টে-সৃষ্টে তিন বছর না জেনে একই ক্লাসের খরচা জুগিয়েছেন।

থ্রি এফ্স্-এ বাধা পড়া তো দূরের কথা, আমি দেখেছি রীতিমতো পাস করা ভাল ছেলেও খরচের অভাবে পড়াশুনা বন্ধ ক'রে তার চাইতে হীন মেধার ছাত্রকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, জীবনে সুবিধে ক'রে নেওয়ার জন্যে। এমন অনেক কেরানী আছেন যাঁর কেরানীগিরি এবং অফিসারগিরির মধ্যে তারই কোন মোক্ষম অতীতে মাত্র একটি পরীক্ষার ফিসের টাকার অভাব ভাগ্য নির্ণয় ক'রে ছিল। সুতরাং উৎসাহ থাকলেও পরীক্ষা দেওয়া হয় না, অর্থই অনর্থ ঘটাতে পারে।

এমন কি উৎসাহ আছে, আর্থিক সামর্থ্যও আছে, এমন লোককেও দেখেছি বাধ্য হয়ে পড়া ছাড়তে হয়েছে। ক্লাসে ছোট ভাইয়ের মতো জুনিয়ার একদিন যে ছিল, সে ফেল করতে ক্লাসের সমবয়সী হয়ে ক্রনিক অকৃতকার্যতার দ্বারা জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্থান লাভ করেছে—এ আপনারা অনেকেই হয়তো দেখেছেন। কিন্তু তিনি পিতৃস্থান লাভ করেছেন, এ আপনাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে কি না জানিনে, তবে আমার হয়েছে—খুলনা জিলা স্কুলে।

হেড মাস্টারের ছেলে পড়তো আমাদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে। আবার আমাদেরই এক সমপাঠীর বাবা পড়তেন অষ্টম শ্রেণীতে। একদিন শোনা গেল হেডমাস্টার অষ্টম শ্রেণীর সেই বাবা-ভদ্রলোককে 'বন্ধু' বলা শুরু করেছেন। গল্পটা শুনলাম পরে। ভদ্রলোক পড়া পারেন নি, হেডমাস্টার তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিলেন। তিনি তখন বললেন : "বলেন কি স্যার? আপনার মণি আর আমার খোকা ওরা দু'জন একসঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে; ভারী বন্ধুত্ব ওদের। আর আপনি আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলছেন?" সেই থেকে সেই ভদ্রলোককে আর কেউ পাঠ জিজ্ঞাসা ক'রে বিব্রত করেনি। তা' না করলেও তিনি বিব্রত হওয়া থেকে নিজেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেননি। ছেলেটি পাস ক'রে এগিয়ে চলল, তিনি ফেল ক'রে ক'রে নিশ্চল হয়ে থাকলেন; সুতরাং ব্যবধান ক্রমশঃ কমতে লাগল। সময়মতো তার ছেলেকে আলগোছে এগিয়ে যাওয়ার অবকাশ দেওয়ার জন্যে সাময়িকভাবে স্কুল ছেড়ে দেওয়ার মনস্থ ক'রে ছাড়লেনও, কিন্তু পরে আর যোগ দিলেন না। বললেন: "খোকার নীচের ক্লাসে পড়াটা ঠিক হবে না।"

সুতরাং দেখছেন থি্ এফ্‌স্ থাকলে বরং কোন লোকসান নেই; কিন্তু না থাকাটা আজকালকার দিনে কিছু অসুবিধে ঘটাচ্ছে। বলছি, কেন? বেকারত্বের দুটো রূপ আছে। পাস ক'রে যে বেকার হয় তারা সহানুভূতি ও আফসোসের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়, বড় অসহায় অবস্থা তাদের। ফেল ক'রে যাচ্ছে যে, পৌনঃপুন্য দিয়ে সে যে-ছাত্রাবস্থা বজায় রাখে; তাতে বেকারের রূপে সে দেখা দিতে পারে না এবং কখনো কখনো দেখা দিলেও কার সাধ্য তাকে সহানুভূতির পাত্র হিসেবে দেখে। পড়ার সময় তার থাকে না এতো ধরতেই হবে, কিন্তু সে দেশের কাজে ওতপ্রোত। মনে তার গ্লানি নেই, দৃষ্টি বহু উর্ধ্বে। হ্যাঁ উর্ধ্বে।

কি রকমে বলছি। আমার এক বন্ধু বললেন কথা তারই একটা। বিধবা খালার এক ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় আটকে পাক খাচ্ছে কয়েক বছর। বাচ্চা ছেলে সগুম্ফ যুবকে পরিণত হয়েছে। মাত্তর 'জিন্দাবাদ' ক'রে ফিরে এসেছে। পরীক্ষা নিকটে, মা বললেন : "বাবা, এসব না ক'রে কষ্টে-সৃষ্টে পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে পাস করো, নইলে খাবে কি ক'রে?" ছেলেটি বেশ একটু মাতব্বরী কায়দায় হাউই শার্টটা খুলতে খুলতে জবাব দিল : "মা, মন্ত্রী হতে ম্যাট্রিক পাস লাগে না।"

মন্ত্রী হতে ম্যাট্রিক পাস লাগে না, এরা পেল কোত্থেকে জানিনে ; তবে বলে শুনেছি।

আমার কাছেই একদিন বার বার বি, এ ফেল করা এমনি এক ছেলে বলল : "আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করবেন না স্যার, মন্ত্রী হতে বি, এ পাস লাগে না।" উত্তরে আমি বললাম : "সে খুব ভাল কথা। তোমাদের বেশীর ভাগ ছেলে ফেল ক'রে ক'রে মন্ত্রী হওয়ার জন্যে নিজেদের উপযুক্ত করছো, বেশ ভাল কথা। কিন্তু বাপু ভয়ের কথা হ'ল এই যে 'ভ্যাকান্সী বড় কম।"

আবার এদের গোষ্ঠীর কারও কারও কথায় বেশ মাতব্বরী ভাব আছে। দেশের কাজ করছে, বেশ ভাল কথা, ফেল করে কেন ? পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে করুক, তা' দেশের পক্ষে নিশ্চয়ই শুভ হবে। সেদিন এ রকম কয়েক জনের সঙ্গে কথা হচ্ছে। ওরা বলল : "যাই বলুন স্যার, উই আর দি টর্চ-বিয়ারার অব দি ফিউচার।" আমি উত্তরে বললুম : "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে বার বার ফেল করায় ব্যাটারী খুব উইক হয়ে পড়েছে এই যা।"

তিন বছরের মধ্যে সার্থকভাবে এদেরকে জীবনের মুখোমুখি ক'রে দিয়ে সত্যিকার জীবনের আস্বাদ গ্রহণে যা সাহায্য করে তাই হ'ল থি, এফ্‌স্। এবং এই জন্যই সেটা দরকার। ঘরের খাওয়াটা বন্ধ ক'রে দিয়ে বনের মোষ তাড়ানোওয়ালাদের একেবারে সরেজমিনে মোষের সামনে দাঁড় করিয়ে যেন যুঝে দেখ, বাপু জীবনটা কি রকম লাগে।

আপনি ও তুমি

অবশ্য যে-ভাষা যত শব্দবহুল সে-ভাষা তত সমৃদ্ধ নয়; ভাষার সমৃদ্ধি দেখা যায় ভাব প্রকাশের ধারায়, শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্যে নয়। ব্যক্তিগত জীবন দেখলে কথাটা যাচাই হবে। ধরুন, আব্দুল করিম পাঁচ হাজার ইংরেজী শব্দ জানেন, আব্দুল গনি সাত হাজার। আব্দুল গনি যে সেই জন্যে আব্দুল করিমের চেয়ে ভাল ইংরেজী লিখবেন তার কোন মানে নেই। ঐ পাঁচ হাজার শব্দ দিয়ে আব্দুল করিম হয়তো বেশ সু-উচ্চ চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারেন, যা নাকি আব্দুল গনি সাত হাজার দিয়েও পারবেন না।

এর চাইতেও বেশী paradox বা প্রতীপ-সত্যের মতো মনে হবে যদি বলি আব্দুল গনি বরং ঐ সাত হাজার নিয়ে বেশী বিপদে পড়তে পারেন। বেশী শব্দ জানার যেটা ভয়, সেটা হ'ল তা' নিখুঁতভাবে জানার দায়িত্ব। ধরুন, একজন হাঁটার একটি মাত্র ইংরেজীই জানেন, তাঁর উল্টোপাল্টা ব্যবহারের ভয় বেশী। কারণ প্রথমজন লিখতে গিয়ে একজনকে শুধু 'হাঁটিয়ে' নিয়ে যাবেন; দ্বিতীয়জন বেশী জানেন বলে হয়তো তিনি তাকেই হেলে-দুলে চালিয়ে নিয়ে যেতে চাইবেন। ব্যস্, ঠিক মতো নিতে না পারলেই তাঁর পরিচালিতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষারও পতন হয়ে যাবে।

এ কথাটা যদি মানেন তবে এটাও মানতে হবে, যদি বলি যে কোন কোন শব্দ এক ভাষায় মাত্র এক-আধটা বেশী থাকলেও, বিদেশিদের তো কথাই নেই, সেই ভাষাভাষিদেরও ব্যবহার ক্ষেত্রে গলদ্ঘর্ম ক'রে ছাড়ে। এই ধরুন যেমন 'আপনি' ও 'তুমি'র ব্যবহার। ইংরেজী ভাষায় শুধু একটি কথাতেই 'আপনি' ও 'তুমি' দুটোই প্রকাশ হয়; 'তুই' অবশ্য ও ভাষাটায় আছে; কিন্তু বর্তমানে এক খোদাকে ছাড়া অন্য কারও উপর ব্যবহার হয় না বলে সামাজিক সংলাপকে জটিল ক'রে তোলে না। সুতরাং নির্বিবাদে লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে যাওয়া যায় বিলেতে, ঝাড়ুদার থেকে প্রফেসর—কার কি মর্যাদা তা' যাচাই করতে হয় না।

ইউরোপীয় ভাষায় যে-সব উপন্যাস ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে তাতে দেখতে পাবেন, যেখানে নায়ক-নায়িকা অন্তরঙ্গ হয়েছে, সেখানে 'তুমি'

বলা শুরু করেছে। তর্জমাতে বন্ধনী দিয়ে তাতে বলা হয়েছে যে এবার থেকে 'thou' বলা শুরু হ'ল। অবশ্য ইংরেজীতে তো 'তুমি' নেই ; কিন্তু আমরা বুঝি ঐ 'তুই' মানেই 'তুমি' ; এবং লরেন্সের বইয়ে দু'এক ক্ষেত্রে এমনি ব্যবহৃতও হয়েছে। সুতরাং দেখছেন, ইউরোপেও আমাদের দশা, অর্থাৎ বিপর্যয় ঘটাতে সামাজিক সম্বন্ধের তিনটি পর্যায় আছে। নিম্নতম স্তর হতে উর্ধ্বতম স্তর এই দুয়ের মধ্যে আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থার প্রভেদ ওদেশের মতো অত না থাকলেও বাহাদুরিতে বোধহয় আমাদের দেশ ওদের চাইতে অনেক বেশী যায়। কারণ মনের সঙ্কীর্ণতার জন্যে এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও আমাদের সামাজিক ভেদাভেদকে আমরা স্তরবহুল করি। এবং উর্ধ্ব স্তর হতে নিম্নস্তরকে যতদূর অধঃপতিত করতে হয় তা' করি। আমাদের অঙ্কশাস্ত্র থেকে উদাহরণ দিলে আশা করি জিনিসটা পরিষ্কার হবে। ধরুন, ইংরেজীতে আছে পাউণ্ড, শিলিং, পেনী ও ফার্দিং। পাউণ্ড ধরুন, তের টাকা। আর ফার্দিং ধরুন, এক পয়সা। তা' হলে দেখছেন উর্ধ্বে যেখানে তের টাকা তাকে চারটে মাত্র স্তরে ফার্দিং-এ পৌছে অর্থের মামলা তারা শেষ করেছে। অথচ আমাদের দেশে দেখুন সর্বোচ্চ হ'ল টাকা মাত্র। অথচ বিভাগের আর শেষ নেই: টাকা, আনা, গণ্ডা ও কড়াতেই শুধু সমাপ্ত নয়—আরও অনেক বিভক্তিতে তা' প্রসারিত। স্বয়ং কড়া সৃষ্টি হচ্ছে কিরূপ দেখুন :

কাগ চতুর্থে
তিন ক্রান্তিতে
নব দন্তিতে
সাতাশ যবে
আশি তিলে—

অর্থাৎ তিলের এত অধঃপতন হয়েছে যে তার তুলনায় ফার্দিং-কে তাল বলা যায়।

অতএব কখনো কখনো আমার মনে হয় 'আপনি', 'তুমি', 'তুই' এ তিনে আমাদের সামাজিক সব সিঁড়িগুলো ভাঙা কিছু অসুবিধেই। অন্ততঃ আর একটা ধাপ হলে মন্দ হতো না। 'আপনি' ও 'তুমির' মধ্যে কিছু একটা থাকা উচিত ছিল। পেটরা-বন্দী কোন শব্দ (portmanteau word) হলেও হতো। যেমন ধরুন 'তুমি' ও 'আপনি' মিলিয়ে 'তুপনি' ধরনের কিছু।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে 'তুপনি'র ক্রিয়াপদ কি হবে? অর্থাৎ 'তুপান কোথায় যাবেন?' না 'তুপনি কোথায় যাবে?'—এর কোনটা হবে? নাকি ক্রিয়াকেও পেটরাভুক্ত করতে হবে: 'তুপনি কোথায় যাওবেন?' এর জন্যে চিন্তা নেই, 'তুমি'র ক্রিয়াই 'তুপনি'তে ব্যবহৃত হতে পারে, কোন অসুবিধেই নেই; দেখুন উর্দুতে চলে 'আপ কিধার যাও গে?'

যাক্ ও নিয়ে আমি প্রবন্ধ রচনা করতে যাচ্ছি না। আমার ব্যক্তিগত জীবনে 'আপনি-তুমি'র সমস্যা, বিশেষত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে, কি ক'রে এসেছিল এবং তার কি ক'রে সমাধান হয়েছে সেই সম্বন্ধেই বলছি।

আপনি-তুমি-তুই এর দু'তরফা প্রতিক্রিয়া হয়। যাকে বলা যায় তার উপর তো হয়-ই, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে বলে তার উপরও হয়। এবং সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়। আমার এক বন্ধু মাজেদ তার এক নিকটতম বন্ধুকে 'তুই' বলতো। একদিন পথ চলতে তাকেই মনে ক'রে অন্য এক ভদ্রলোককে 'কিরে?'—বলে সম্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গে ভুল বুঝতে পেরে বলেই ফেলল 'কিরেন?' সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন এরূপ ভুল সংশোধনে মন কতদূর জাগ্রত। কেন জানেন? এ শুধু এই জন্যে যে, আপনি-তুমির ব্যবহার নানা রকমে সমস্যার পর্যায়ে এসে লোককে অপ্রস্তুত করতে পারে।

আমরা তখন ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ছিলেন ডাঃ দাশগুপ্ত। তিনি বোধহয় এ সমস্যাটি খুব হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাই তিনি তৃতীয় পুরুষে অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন। দেখতে আসতেন, জিজ্ঞাসা করতেন, 'রুগী কে?' রুগী বলতো, 'এই আমি।' মনে করতাম বলবেন, 'ও আপনি?' তা' বলতেন, 'ও আচ্ছা।' রুগী একটু উঠতে যেত, মনে করতাম বলবেন, 'উঠবেন না।' বলতেন, 'উঠতে হবে না, শুয়ে থাকাই ভাল।' তার পর অনর্গল তৃতীয় পুরুষে চালাতেন কথা: কি খাওয়া হচ্ছে? অসুবিধা কিছু হচ্ছে? এই যে টিপ দিচ্ছি, ব্যথা পাওয়া যাচ্ছে কি? দয়া ক'রে একটু ঘুরলে lungs পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি। এই যে ওষুধ দিচ্ছি এটা তিনবার ক'রে খেতে হবে। আর দু'দিন পরে আমাকে খবর দিতে হবে, মোটেই ঘাবড়াবার কিছু নেই ইত্যাদি। একদিন আমি মনে করেছিলাম এইবার কোণঠাসা হয়েছেন—কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় পুরুষের কোন কোণই ছিল না, তা' আর ঠাসা হবেন কি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আমি ক্লাস করতে

পারব কি?" বললেন: "তা' ক্লাস করতে—" আমি মনে করলাম 'পারবেন' বলা ছাড়া উপায় নেই; কিন্তু তিনি অভ্যাসের সাবলীলতায় বলে গেলেন: "তা ক্লাস করতে পারা যেতে পারে, তবে শরীর ততটা ভাল না লাগলে না যাওয়াই ভাল।"

তাঁকেই প্রথম স্মরণ করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান ক'রে। এত লোক থাকতে তাঁকে কেন? তাই বলব। আমাদের শিক্ষকগণ তাঁদের প্রত্যক্ষ ছাত্রগণের সঙ্গে যখন আলাপ করেন তখন অনায়াসে তাদেরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন। অন্য বিভাগের ছাত্রকে 'আপনি' এবং অত্যন্ত পরিচিত হলে 'তুমি'ও বলেন। আবার কেউ কেউ সকলকেই 'আপনি' বলেন, এঁরা সাধারণতঃ কম-বয়সী। কলা ও বিজ্ঞান যাঁরা পড়ান তাঁরা যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হোন না কেন, তাঁদের ও আমার মধ্যে দিন-রাতের তফাত। কারণ তাঁরা পড়ান দিনে, আমি রাতে। রাতেই আমার ক্লাস। কিন্তু তাঁদের ছাত্রে ও আমাদের ছাত্রে যে দিনরাতের তফাত তা' দিনে পড়া রাতে পড়া থেকে নয়, তা' সত্যিই দিন-রাতের তফাত। আইনের ছাত্রদের অনেকেই এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবেশ সঙ্গে ক'রে আনেন যে, তাঁদের ছাত্রাবস্থার মানে গিয়ে দাঁড়ায় ছাত্রদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসে শিক্ষালাভ করা মাত্র; তাঁদের স্বাতন্ত্র্য মেলামেশার দ্বারা বাড়ে বই কমে না। অর্থাৎ তাঁদের একজন আর-একজনের সঙ্গে যত বেশী মেলেন ততই বুঝতে পারেন তার থেকে তিনি কত তফাত। কারণ তাঁদের যে কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূত, তার সমন্বয় সাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সহধর্মী কিছুই নাই। কি ক'রে থাকবে?—শুনুন।

আইন, প্রথম বর্ষ। প্রথম দিন ক্লাসে পরিচয় জিজ্ঞাসা করছি। একটি ছাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "স্যার, আমাকে চিনতে পারেন?" আমি বললাম: "হ্যাঁ, চেনা চেনা মনে হচ্ছে।" তিনি বললেন: "হ্যাঁ স্যার, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, মুসলিম হলে থাকি, আপনি স্কুলে পড়তেন। একদিন অমুকের সঙ্গে এসেছিলেন।" সকলে হেসে উঠল। আমি চিনলাম, কারণ তারই অনেক বছর পরে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়েছিলাম তাঁকে একদিন 'উনি আজকাল কি করেন, জিজ্ঞাসা করায় সে ভদ্রলোক বললেন: "তিনি বি এ পরীক্ষা দিয়ে থাকেন।" ষোলবার বি এ পরীক্ষা দিয়ে পাস করেন, তার পর আইন পড়েন।

অন্য ছাত্রেরাও আছেন যাঁরা ভাল পাস ক'রে গিয়েও বহু বৎসর আইন অধ্যয়ন করেন। তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে বসলেও ঠিক ছাত্র হয়ে উঠতে পারেন না। তা' হলে দেখছেন কেমন ক'রে দিন ও রাতের ছাত্রদের মধ্যে দিবা-রাত্র তফাত হয়। সুতরাং দিনের 'তুমি' সম্বোধনটা রাতে জমে না।

অবশ্য এদেরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে বাধে না; কিন্তু বয়সের ক্রমনিম্নায়মান সংখ্যা যখন উত্তর পঞ্চাশ হতে নামতে থাকে, তখন তুমি বলার বয়সের কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে এবং আপনি বলার বয়সের কিঞ্চিৎ নিম্নে এমন এক বয়ঃসন্ধি কালে উপনীত হয় যেখানে 'তুমি' ও 'আপনি' এর কোনটা দিয়েই সচ্ছলতার সঙ্গে কথা বলা মুশকিল হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার উভয় কূল রক্ষায় সমর্থ হয়। কিন্তু তৃতীয় পুরুষ সচ্ছলতার সঙ্গে ব্যবহার এক ডাক্তার দাশগুপ্ত ছাড়া অন্য কাউকে করতে দেখিনি, সুতরাং ওটার আংশিক কারণ এখনো ব্যক্তিগত পর্যায়েই ন্যস্ত রয়েছে, সামগ্রিক হয়ে সামাজিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। তাই পেটরা-শব্দ 'তুপনি' প্রবর্তনের কথা বলছিলাম।

'আপনি' ও 'তুমি'-র ব্যবহারই বহুক্ষেত্রে সঙ্কটময় হয়ে ওঠে। 'তুই'-র ব্যবহারটা কখনো হয় না। 'তুই'তে আমাদের সম্পর্কের পরিষ্কার রফা হয়ে যায়। অর্থাৎ যাকে আমরা 'তুই' বলি, সে 'তুই'-ই। তাকে তুমি বললেও কোন ছন্দপতন হয় না। 'তুই' কথাটা তুচ্ছার্থেই ব্যবহার হয় বেশী, তাই মনের ছকে ঠিকমতো একটা স্থান কারও জন্যে নির্দিষ্ট না হলে তাকে আমরা 'তুই' বলি না। এমন কি, 'তুই' তুচ্ছার্থে ব্যবহারের যে-ব্যতিক্রম হয় অত্যন্ত আপনজনের প্রতি তার প্রয়োগে, সেখানেও মনের মধ্যে অন্তরঙ্গতার পরিষ্কার ছাপ থাকে। সুতরাং 'তুই' ব্যবহারের মধ্যে কোন সঙ্কোচ থাকে না। কিন্তু 'আপনি' ও 'তুমি' সামাজিক রেস্তাকে কখনো কখনো এমন জড়িয়ে ফেলে যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি আনতে বাধ্য।

ধরুন, আপনি জীবনের প্রথমাবস্থায় সুবিধা করতে পারেন নি। অথচ আপনার খুব নিকট বন্ধু, তিনি লাখোপতি হয়ে গেছেন; কিংবা লাট-বেলাট কিছু হয়ে গেছেন; অনেকদিন পর আপনি গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে; আপনার অবশ্য পুরনো স্মৃতি জাগরুক আছে মনে। গিয়ে 'তুমি' বলে কথা আরম্ভ ক'রে দেখলেন আপনার বন্ধু আপনাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন। যদিও তাঁর ব্যবহার আপনার প্রতি অমায়িক, তবুও আপনার

সন্দেহ হ'ল যে তিনি পুরনো স্মৃতিকে গ্রহণ করলেও পুরনো পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে খুব রাজী নন। তাই আরও দু'একবার 'তুমি' চালিয়ে গেলেন এই ইশারা দেওয়ার জন্যে যে আপনাদের মধ্যে 'তুমি'র সম্পর্কই ছিল। শুধু তাই নয়, একটু ওভারডোজও দিলেন এই বলে: "তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে, 'তুই একটা আস্ত—' " এইটুকু শোনার পর ভদ্রলোক অত্যন্ত হেসে বললেন: "ঠিক, ঠিক, মনে আছে। পুরনো দিনের কথা কি ভোলা যায়—আমি ঐটুকু বলার পর আপনি মনে করেছিলেন যে 'গাধা' বলবো, কিন্তু আমি বলেছিলাম 'মুর্দাফরাস'। সকলের সে কি যে হাসি। যে দিন যায় তা' আর ফিরে আসে না।" তিনি যে আপনাকে 'তুই' বলতেন আপনার দ্বারা তার উল্লেখ কিছুমাত্র তাঁকে বিচ্যুত করতে পারল না। শেষে আপনি 'আপনি' ব্যবহার ক'রে, বহু আলাপ ক'রে চলে এলেন।

এখন ধরুন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আপনি কৃতী, তিনি ফতুর, এই অবস্থা। ঠিক ওর উল্টোটা ঘটবে, অর্থাৎ তিনি চাইবেন 'তুমি' বলতে আর আপনি 'আপনি' দিয়েই চালাবেন। কারণ তার সঙ্গে পুনরায় 'তুমি'র সম্বন্ধ স্থাপন করার সচ্ছলতা আপনার মনে আর আসবে না। এ হবে এ জন্যে যে, 'তুমি' ও 'আপনি'র মধ্যে বেশীর ভাগই যে-তফাত সেটা হ'ল নিকটত্ব বোধের তফাত। তুমি তুচ্ছার্থে ব্যবহার খুবই কম হয়। ওটা বেশীর ভাগই ব্যবহৃত হয় আপন ভাবে গ্রহণ করার স্বীকৃতি হিসেবে। সুতরাং সেই স্বীকৃতি একবার ব্যাহত হলে আর তার পুনরুদ্ধার করা কঠিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান ক'রে আপনি-তুমির সমস্যা কি ক'রে 'আপনি'কে শেষ করে সমাধান করেছি, সেই কথাই বলব; কিন্তু তার আগে একটা কথা বলা দরকার। সেদিন দুটি ছেলে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে, মানে নিছক আলাপ করতে। খুশী হয়ে তাদের একজন বলল: "স্যার, আপনাকে আমরা সকলে এত ভালবাসি যে আপনি যে 'তুমি' বলেন, তাতে কেউ কিছু মনে করে না।" সকলে ভালবাসে, বেশ ভাল কথা। কিন্তু 'তুমি বলায় কেউ কিছু মনে করে না'—এ যে একেবারে উল্টা-বুঝিলি-রামের মতো হয়ে গেল। কেন, তা' আমি বললে সকলে বুঝবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর সকল ছাত্রকেই আমি 'আপনি' বলতাম। ক্রমে ক্রমে দু'চারটি ছাত্র আমার সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে আমার আন্তরিক স্নেহ লাভ করে; সুতরাং তাদেরকে 'তুমি' বলতে শুরু করি। পরে

দেখা গেল ঐ ছাত্রগুলি তদানীন্তন ছাত্র সমাজের সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী, স্মার্ট এবং অন্যান্য ছাত্র দ্বারা সম্মানিত ছাত্র। অবশ্য আমি তাতে কিছুই আশ্চর্য হইনি। কারণ জানতাম তাদের আত্মিক সমৃদ্ধি থাকার দরুনই আমার আন্তরিকতা লাভ করেছে। তাদের দল আস্তে আস্তে যখন বাড়ল, তখন এই সত্যটাই যেন সকলের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল যে বুদ্ধির দীপ্তি আছে বলে যারা সুপরিচিত, তারাই আমার সান্নিধ্য লাভ ক'রে আমার দ্বারা 'তুমি' সম্বোধনে সম্বোধিত হয়। অর্থাৎ আমি যাদের 'তুমি' বলছি তারা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। ব্যস্, 'তুমি'র সঙ্গে 'আপনি'ও আমার বাসায় আসতে লাগল। ওকে তুমি' বলছেন আমাকে 'আপনি' কেন?—এমন ওজরও তুলল। শেষকালে এমন একটা পরিস্থিতি হ'ল যে কতকগুলো ছাত্র, আমি 'তুমি বলে তাদের সঙ্গে ব্যবধান রাখতে চাই, এমনি একটু দোষারোপের মতোও করল। শেষ পর্যন্ত সকলকে খুশী করার জন্যেই 'তুমি' বলা শুরু করলাম। সুতরাং দেখলেন তো, তুমি বলায় কিছু মনে করার প্রশ্নই ওঠে না, 'তুমি' না বলায় মনে করার প্রশ্নই ওঠে। আমি তো মনে করেছি 'তুমি' বলায় তারা প্রসাদ লাভ করছে। সুতরাং এর মধ্যে যারা ভাবে যে আমি 'তুমি' বলায় তারা কিছু মনে করে না, তাদেরকে আমি এখন থেকে পরিষ্কারভাবে খুশী হতে বলছি। যদি না হয় তবে আবার আমি 'আপনি' ব্যবহার করে পূর্ব পরিস্থিতিকে আর-এক পাক ঘুরিয়ে এনে সত্যটা তাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেব।

তুমি বলা যে আমার পক্ষে কি কষ্টকর তা' আমিই জানি। নতুন যাঁরা আসেন তাঁদের সঙ্গে তৃতীয় পুরুষে একটু আলাপ করে ধরি যে তিনি নিজে ছাত্র, না ছাত্রের অভিভাবক। ছাত্র স্থির হলেই তবে 'তুমি' বলি। অনেক সময় অভিভাবককে ছাত্রের চাইতে বয়সে কম দেখায়, তখনই মুশকিল। সে-ক্ষেত্রে বহু কষ্টে তৃতীয় পুরুষ এস্তেমাল ক'রে অভিভাবককে ছাত্র-বলে-ভুল-ধরা থেকে নিজেকে উদ্ধার করি। যেমন ধরুন, দু'তিনজন ছাত্র হলে 'সিটে'র জন্য দরখাস্ত করেছে। একজন অভিভাবক দিয়েছেন একটি। জিজ্ঞাসা করি : "এখানা কার?" অভিভাবক বলেন : "আমার।" অর্থাৎ তিনি ওটা এনেছেন। কিন্তু আমি তো তখনও বুঝতে পারিনে। জিজ্ঞাসা করি : "কোন্ ইয়ার?" তিনি বলেন : "ফার্স্ট ইয়ার এম এ।" যা বয়স তাতে তিনি ফার্স্ট ইয়ার এম এ পড়লেও দোষের হবে না। আমি তো

প্রশ্ন করি এই জন্যে যে হঠাৎ যদি এমন কিছু বলে ফেলেন, যেমন আমি ফার্স্ট ইয়ার এম এ-তে পড়ি, তা' হলে ধরে নেব যে তিনি ছাত্র। কিন্তু কাজ এগোয় না। কপাল ঠুকে জিজ্ঞাসা করি: "কবে 'সিট' চাই?" তিনি হঠাৎ বলেন: "দু' একদিনের মধ্যেই ও আসবে; কাজেই আজকে হলেই ভাল হয়।"

তখন বুঝি উনি অভিভাবক। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, তুমি বলায় যে দায়িত্ব চাপে তাতে আমি নিজে খুব খুশী নই।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এমনও তো ছাত্র থাকতে পারে যারা হয়তো এত কথা বলার পরেও 'আপনি' বললে খুশী হয়। তারা যদি খুলে বলে তো 'আপনি' বলে আমি তাদের চাইতেও বেশী খুশী হব। আর যদি খুলে না বলে তা' হলেও দোষ নেই।

কারণ, আমি 'তুমি' বলায়, 'আপনি' হতে তারা যা হারায়, তার চাইতে পায় বেশী। অর্থাৎ 'আপনি' হতে ই-কার হারিয়ে 'আপন' হয়ে ওঠে।

